ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন-বৃত্তান্ত।

—:*:—

প্রতিকৃতি সহিত।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ও স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের
জীবনচরিত প্রণেতা
শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত।

কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

১লা ফাল্গুন, ১৩৩১

সূচী।

ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের

জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার আকানগর গ্রামে বাঙ্গলা ১২৩৬ সনের ১০ই ফাল্গুন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) রবিবার দিবস কালীনারায়ণের জন্ম হয়।

কালীনারায়ণের পিতা সুধারাম সেন এবং মাতা যশোদা উভয়েই সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সুধারামের চারিটি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ মাধবচন্দ্র চারি বৎসর বয়সে ভাটপাড়ার গুপ্ত পরিবারে দত্তকরূপে গৃহীত হইয়া কালীনারায়ণ নাম প্রাপ্ত হন।

কনিষ্ঠ পুত্রটিকে দত্তক দেওয়ায় যশোদা ঠাকুরাণীর দুঃখের অবধি ছিল না। তাঁহার স্বামী এবং অন্যান্য পুত্র কন্যাগণের অকালে বিয়োগ হওয়ায় শোক দুঃখে তাঁহার জীবন ভারবহ হইয়াছিল। সলাস গ্রামে সহোদর লোচন রায়ের গৃহে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন গত হয়।

বালক কালীনারায়ণ সময় সময় পালয়িত্রী মার নিকট হইতে গর্ভধারিণীর নিকট আসিতেন। তখন পুত্রমুখদর্শনে দুঃখিনী জননীর দগ্ধহৃদয় ক্ষণকালের জন্য শীতল হইত। কখনও বিচ্ছেদশোক

প্রবল হইয়া তাহাকে অধীর করিয়া তুলিত। কালীনারায়ণ পরবর্ত্তী জীবনে গর্ভধারিণী মার তখনকার ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"আমাকে সংসারে রাখি, তিন জনে দিল ফাঁকি,
ফাঁকি দেখে বড়ই ডরাই ;
তোমারে আমার কর্‌তে, মুখে চাহে না বলিতে,
আমার ক'রে তোরে বা হারাই।
বেঁচে থাক পরের ধন, পরের হ'য়ে থাক ধন,
ধনে জনে চিরজীবী হ'য়ে,
সোণার ভাত তুমি খাও, সোণাতে ডুবিয়ে যাও,
সোণার ঘরে থাক তুমি শুয়ে। *

গর্ভধারিণী মার ভালবাসার স্মৃতি শেষ জীবন পর্য্যন্ত কালীনারায়ণ কিরূপ রক্ষা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ,—

"হা উদার প্রাণদাতা, কি মিষ্ট মায়ের কথা,
হয় বা না হয় সমন্বয় ;
সোণার অন্ন খেতে পারে, মায় নি (কি) বিশ্বাস করে,
অথচ সোণার অন্ন কয়।
সোণার অন্ন কথাখান, স্নেহের অন্নে বিদ্যমান,
এ অন্ন ত আর কোথা নাই ;
একেই ত মিষ্ট মাতা, মিষ্ট মায়ের মিষ্ট কথা,
মিষ্টে মিষ্টে ইষ্টসিদ্ধি পাই।

---

* কালীনারায়ণ-রচিত মাতৃ-স্মৃতি।

যা কৃপা তোমার দান, বিদ্যমান মহা প্রাণ,
বল বুদ্ধি প্রার্থনা না চায় ;
কেমনতর সূতে সূতে, উদারের সুধারেতে,
ধারে ধারে ঠেকে এসে গায়।*

বালক কালীনারায়ণ চারি বৎসর বয়সে গুপ্ত পরিবারে আনীত হইয়া শিক্ষা ও উন্নতির মুক্ত পথ প্রাপ্ত হইলেন।

গুপ্ত বংশ।

ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায় ভাটপাড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ভদ্রলোকের বাস। এই গ্রামের গঙ্গাপ্রসাদ গুপ্তের বংশ বিশেষ সম্মানিত। রাজারাম, নিত্যানন্দ, সীতারাম, ও তিতারাম নামে গঙ্গাপ্রসাদের চারিটি পুত্রের জ্যেষ্ঠ রাজারামের পুত্র মহীন্দ্রনারায়ণের পত্নী ভাগীরথী দেবী কালীনারায়ণের পালয়িত্রী মাতা।

রাজারাম ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। প্রায় সমস্ত জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া শেষ বয়সে পুরীর জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, এবং তথায় লোকনাথমন্দিরে তাঁহার লোকান্তর হয়। তাঁহার প্রাণহীণ অসার দেহ ধ্যানমগ্নাবস্থায় ঐ দিন প্রভাতে তথায় পাওয়া গিয়াছিল। কালীনারায়ণের শৈশব জীবন এই রাজারামের পত্নী রাজেশ্বরীর আদর যত্নে অতিবাহিত হয়। নানা গল্প ও শ্লোক শুনাইয়া তিনি বালকের শিশুমনের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন।

রাজারামের পুত্র মহীন্দ্রনারায়ণ ময়মনসিংহ সহরে ফৌজদারী

---

* মাতৃ-স্মৃতি ২৩ পৃষ্ঠা।

সেবকারের কর্ম্মে পার্থিব বিষয়ের উন্নতি ও পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে দানসাগর করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। তিনি প্রথমে পিতার নামে কাত্তরাদি নামক তাকের এক অংশ ও পরে খুল্লতাত মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন ভয়ে উপরোক্ত সম্পত্তির অপর অংশ তাঁহার নামে ক্রয় করেন। এইরূপ আরও অনেক ঘটনায় তাঁহার সমদর্শিতার পরিচয় পাইয়া লোকে তাঁহাকে মুনির পুত্র মুনি বলিত।

মহীন্দ্রনারায়ণ ২৬ বৎসর বয়সে ভাটপাড়ার ব্রজকিশোর দাসের কন্যা ৯ বৎসর বয়স্কা ভাগীরথী দেবীর পাণিগ্রহণ, এবং বিবাহের পর দশ বৎসর মধ্যেই বৃদ্ধা জননী ও নিঃসন্তান পত্নীকে শোকে অচ্ছন্ন করিয়া পরলোক গমন করেন।

ইহার পর ভাগীরথী দেবীর ভ্রাতা রামকানাই ভগিনীর সান্ত্বনার জন্য বালক কালীনারায়ণকে পোষ্যপুত্র করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। এই শিশু আপন চরিত্রমহিমায় অল্পকাল মধ্যে নূতন মাতার সন্তানতুল্য, এবং অপত্যহীন ভাগীরথী দেবীও ঈশ্বরকৃপায় অপত্যস্নেহের অধিকারিণী হইয়া অতি যত্নে মাতৃকর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্তা হইলেন।

ভাগীরথী দেবীর চরিত্র যেমন নারীয় স্নেহ মমতায় তেমনি পুরুষোচিত সাহস ও দৃঢ়তায় পূর্ণ ছিল। তিনি বালক কালীনারায়ণের পিতৃমাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। কালীনারায়ণ পরবর্ত্তী জীবনে ভাগীরথী মার চরিত্র এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—

"মাতৃভাবে পোষে মোরে পরম যতনে,
পিতৃভাবে শিক্ষা দীক্ষা চরিত্রশোধনে.
কিসে আমি ভাল হই, কিসে হয় জ্ঞান,
দিবস যামিনী মার এ অনুসন্ধান।

চরিত্র যাহাতে শুদ্ধ থাকে সর্ব্বদায়,
একারণ রাগ রক্ত বজ্রোদ্যত প্রায়,
এইরূপ অগ্নি জলে জ্বলন্ত জীবন
দিবা রাত্রি জ্বলিতেছে বাড়ব যেমন।" *

শিক্ষা।

বালক কালীনারায়ণ গুপ্তপরিবারে আনীত হইয়া কিছু দিন সকলের আদর যত্নে ও ধূলা খেলায় যাপন করেন। পরে ছয় সাত বৎসর বয়সে হাতে খড়ি ও দাদা মহাশয় ব্রজকিশোর দাসের নিকট শৈশব শিক্ষার আরম্ভ হয়। ব্রজকিশোরের গৃহ গুপ্তগৃহ হইতে অল্প দূরেই ছিল। একজন ভৃত্য প্রতিদিন বালককে তথায় রাখিয়া আসিত এবং পড়া শেষ হইলে লইয়া আসিত। তথায় বালকের আদর যত্নের অভাব ছিল না। কখনও মাতুলানীর ক্রোড়ে থাকিতেন, কখনও দাদামহাশয়ের ক্রোড়ে বসিয়া পড়া শিখিতেন। যে কালে গুরুমহাশয়ের বেত্রভয়ে শত শত বালকের নিকট বিদ্যাদেবী যমরাজার সহচরীতুল্যা ছিলেন, সেইকালে এমন আদর ও আনন্দের মধ্যদিয়া বাল্যশিক্ষা শেষ করা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়।

বালক কালীনারায়ণের একটি খেলার দল ছিল। তিনি সেই দলের নেতা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে নানা প্রকার ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া বালকদল কত সুখানুভব করিত। পাখীর ছানা চুরি, কি বাছুরের বলিদান ইত্যাদি কোন প্রকার নিষ্ঠুর আমোদে এই দলের উৎসাহ ছিল না। হাকিম উকীল সাজিয়া বিচারের অভিনয় করা তাঁহাদের ক্রীড়ার প্রধান বিষয় ছিল। কেহ কেহ আসামী কি ফরীয়াদী হইতেন, কেহ বা বিচারক হইয়া সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেন।

* মাতৃ-স্মৃতি ৩৪ পৃষ্ঠা।

বাল্যকালেই কালীনারায়ণের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একবার বাড়ীর কোন অনুষ্ঠানে সানাই বাজনা হইতেছিল। বালক কালীনারায়ণ বাদ্যকরের নিকট সানাই চাহিয়া না পাইয়া বিরক্ত হইলেন, এবং ঘরের ভিতর হইতে তেঁতুল নুন আনিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আগ্রহের সহিত খাইতে লাগিলেন। তেঁতুল খাইতে দেখিয়া বাদ্যকরের মুখে এমন লালা নিঃসৃত হইল যে, তাহার সানাই-মুখের ছিদ্রপথ বন্ধ হইয়া গেল। তখন বাজাইতে না পারিয়া বাদ্যকর মাতাঠাকুরাণীর নিকট নালিশ করিল। মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বালকের বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইলেন।

"যখন তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর তখন সমবয়স্কদের সঙ্গে একদিন আমবাগানে আম পাড়িতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন নানা গাছে নানা রকমের আম পাকিয়া আছে। হাসিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্ ঈশ্বর বেটার কি স্মরণশক্তি রে। গেল বছর যে গাছে যে নমুনার আম ঝুলাইয়াছিলেন, এবছরও ঠিক ঐ গাছে ঐ নমুনার আম ঝুলাইয়াছেন। আচ্ছা, আমার মায়ের ত এই একটাই আমবাগান। তা যেন কোন রকমে মনে রাখ্‌লে। কিন্তু এই গ্রামটার মধ্যে ত এমন কত বাগান আছে! কেমন করিয়া যে সে বেটা এত মনে রাখে বুঝি না"। গ্রাম্য বালকেরা তাঁহার এ কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু তিনি নিজে এ ঘটনা কখনো ভুলিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে গল্পচ্ছলে কত সময় কত লোককে তাঁহার এই শিশু বুদ্ধির কথা বলিয়া আমোদ করিতেন।" *

* শ্রীযুক্তা বিমলা দাস মহাশয়ার লিখিত পিতৃস্মৃতি ৩৪ পৃষ্ঠা।

শিক্ষা।

প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে অনেক সময় নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খল ভাবের যোগ দেখা যায়। কিন্তু বালক কালীনারায়ণের প্রতি ভাগীরথী দেবীর সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কখনও কিছু ঘটিতে পারিত না। মাতার বুদ্ধি, বিবেচনা, ধীরতা, স্নেহ এবং মঙ্গলইচ্ছা বালক কালীনারায়ণের ভাবী উন্নতির সহায় হইয়াছিল।

দাদামহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কালীনারায়ণ কিছুদিন রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যের টোলে সংস্কৃত পড়িয়া পরে পার্শি শিখিতে আরম্ভ করেন। তখন দেশময় পার্শির প্রচলন ও রাজসরকারে পার্শির সমাদর ছিল। এজন্য তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহার পার্শি শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। গোলকনাথ রায়, বাঁকাকৃষ্ণ রায়, কুঞ্জমোহন সেন প্রভৃতি অনেকের নিকট তিনি পার্শি শেখেন। পরে ঢাকায় গিয়া মহম্মদ আলি সাহেবের মাদ্রাসায় একজন মুন্সির নিকট গুলেস্তা, বোস্তা, এবং অন্যান্য কেতাব ও কায়দা অভ্যাস করেন। এইরূপে পার্শি ও উর্দ্দুতে তাঁহার কথা-বার্ত্তা বলিতে অধিকার জন্মে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ময়মনসিংহ গমন করেন। তথায় খুল্লতাত হরিশ্চন্দ্র রায়ের বাসায় থাকিয়া আরও কিছুদিন পার্শি পড়িয়া অভিভাবকগণের পরামর্শে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই অভিভাবকগণের মতের পরিবর্ত্তন হয়। ইংরেজী শিক্ষা চারিদিকে নানা অনাচারের সৃষ্টি করিতেছে ভাবিয়া তাঁহারা কালীনারায়ণের ইংরেজী শিক্ষা স্থগিত করেন। ইতিমধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া খুড়াদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া পৃথকান্ন হইতে অভিলাষী

ও কালীনারায়ণ তাড়াতাড়ি গৃহে যাইতে বাধা হওয়ায়, তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হয়।

যদিও তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বন্ধ হইল, তাঁহার উন্নতির পথ কিন্তু বন্ধ হইল না। তাঁহার নানা বিষয়ে এমন স্বাভাবিক শক্তি ছিল যে, অনেকের পক্ষে শিক্ষা ও চেষ্টাদ্বারাও তাহা লাভ করা কঠিন। আলোচনাদ্বারা এই সব শক্তির বিকাশ হওয়ায় নানা দিকে তাঁহার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। চিকিৎসাবিদ্যা তিনি কখনও অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু যৌবনারম্ভেই শুধু বুদ্ধি কৌশলে অনেক সময় চিকিৎসায়, এমন কি সামান্য ছুরিকার সাহায্যে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া, আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করেন। লোকের তাঁহার প্রতি যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তদ্দ্বারা তাঁহাদের অনেকের আশ্চর্য্য উপকার হইত। এইরূপে জনসেবায় তিনি গ্রামস্থ আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসা লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতে শিল্পে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল। অনেক সময় স্বহস্তে অনেক সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতেন। এমন কি গ্রামের কুম্ভকারগণ সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাঁহার পরামর্শ লইত। একবার ইক্ষুনির্য্যাসের একটি কল নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বিশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দুর্গোৎসবের সময় নিজ বাড়ীতে সামান্য নরুণদ্বারা নিজ হস্তে প্রতিমা গড়িতেন।

বিবাহ।

ভাগীরথী দেবী অকালে বৈধব্যে উপনীত হইয়া জীবন উদ্দেশ্য-বিহীন, এবং গৃহ শূন্য বোধ করিয়াছিলেন। পরে পুত্র ও

স্বর্গীয়া অন্নদাসুন্দরী গুপ্তা

অপত্যস্নেহলাভে মনের অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলে, পরিবার গঠন করিয়া শূন্য পুরী ধনে জনে পূর্ণ দেখিবার আশায় বাল্যেই পুত্রের বিবাহ দিলেন। ১২৪৯ সনের মাঘ মাসে ভাটপাড়ার নিকটবর্ত্তী পাঁচদোনা গ্রামের বিখ্যাত দেওয়ান দর্পনারায়ণের বংশধর মাধবরাম সেনের অষ্টম বৎসর বয়স্কা কন্যা অন্নদার সঙ্গে বিবাহ (গৌরী দান) হইল।

এই সময় কালীনারায়ণ ত্রয়োদশ বৎসরের বালক। বাল্য ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকে কি গুরুতর ভার ন্যস্ত হইল, তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এইরূপে তাঁহার পারিবারিক জীবনের আরম্ভ এবং নববধূর আগমনে ভাগীরথী দেবীর গৃহ আনন্দপূর্ণ হইল।

অন্নদা রূপে লক্ষ্মী এবং সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তিনি স্বামী-গৃহে আসিয়া অল্পকালমধ্যেই বালিকাসুলভ স্বভাব সত্ত্বেও সুগৃহিণীর পরিচয় দিতে লাগিলেন। কি রন্ধনে কি পরিবেশনে তাঁহার অন্নদা নামের সার্থকতা অচিরে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল। আচার ব্যবহারে, লজ্জাশীলতায় ও মিষ্ট স্বভাবে পরিবারস্থ গুরুজন হইতে দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইলেন। গৃহকর্ম্মের শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা দেখিয়া শাশুড়ীর পুত্রবধূ গৃহে আনা সার্থক জ্ঞান হইল। ভাগীরথী দেবী অতঃপর কায় মনে পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গলাশায় এবং তাঁহাদের সন্তানের মুখ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দেবতার মস্তকে প্রতি দিন বিল্বপত্র দিতে লাগিলেন।

এই সময় যদিও কালীনারায়ণের বয়স অল্প, তবু তিনি স্বামীর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া পত্নীর শিক্ষাদানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায় অন্নদা ধীরে ধীরে সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা হইয়া উঠিলেন।

তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই সন্তানগণও বিবিধ গুণের আধার হইয়া গুপ্ত পরিবারকে পূর্ব্ববঙ্গে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা।

প্রায় সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালীনারায়ণ ময়মনসিংহের অন্তর্গত উখরাশাল গ্রামের প্রসিদ্ধ জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট সস্ত্রীক শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুরুগিরি ব্যবসায় ছিল।

ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ, মুড়াপাড়ার জমিদার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া কালীনারায়ণ এক বৎসর কাল পুষ্প নৈবেদ্য আদি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করেন। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি তখন তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার নিষ্ঠা দর্শনে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মতের পরিবর্ত্তন।

যুবক কালীনারায়ণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া কিছুদিন নিয়মিত রূপে দেবতার নিত্য অর্চ্চনা, বিষয়সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ, এবং সংসারধর্ম্ম স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করেন। পরে একটি লোকের নিকট মানস পূজার শ্রেষ্ঠতা ও বাহ্য পূজার নিকৃষ্টতা শুনিয়া তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। "উত্তমা মানসী পূজা, জপ পূজা তু মধ্যমা, অধমা প্রতিমাপূজা, বাহ্য পূজাধমাধমা" এই শ্লোক্ তাঁহার মনে এমন আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল যে, বাহ্যপূজায় তাঁহার বিশ্বাস একেবারে শিথিল হইয়া যায়।

এতদিন তিনি বাড়ীতে বসিয়া পূজা করিতেন; এখন পুকুরের ঘাটে বসিয়া সাধারণ ভাবে ও শিবশঙ্কর সেনের প্রতিষ্ঠিত পুকুরপারের শিবমন্দিরে বসিয়া বিশেষ ভাবে মানস পূজায় রত হইলেন। তিনি মনে করিলেন নির্জ্জন দেবমন্দিরে বসিয়া মনে মনে নৈবেদ্যাদি উপকরণ ও পুষ্প চন্দনাদি দ্রব্যের কল্পনা করিয়া পূজা করাই মানসপূজা। সুতরাং একদিকে কাল্পনিক মানস পূজার অনুষ্ঠান, অপর দিকে প্রতিমা ও বাহ্য পূজা লইয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক চলিতে লাগিল। কিন্তু তর্কে শুধু তর্কেরই বৃদ্ধি হয় না, সংশয়েরও বৃদ্ধি হয়। আর তাহাতে মতের পরিবর্ত্তনও সহজে হইয়া থাকে।

কালীনারায়ণ চিন্তার আন্দোলন মনে লইয়া ঢাকায় গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি পুনরায় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকদিন নর্ম্মাল

স্কুলে ও কতক দিন মুন্সী কুদরতুল্লার নিকট পার্শি শিক্ষা করিলেন। এই সময় একদিন অপরাহ্নে তাঁতিবাজারে সুলতানসাদিগ্রাম-নিবাসী রামানন্দ সেনের বাসায় গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের গোকুলচন্দ্র সেন ঐ বাসায় থাকিতেন। তিনি হিন্দুসংস্কারবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে দেখিয়া কালীনারায়ণকে 'তুই কি ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া তিরস্কার করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী কাহাকে বলে, ব্রহ্মজ্ঞানীর আচরণ কেমন, ব্রহ্মনামের অর্থ কি, কালীনারায়ণ এ সকলের কিছুই জানিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী কেন তিরস্কারভাজন স্বতঃই তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হইল। *

এই সময় কাওরাদির মহাল বাটরা উপলক্ষে উহার ছাম দেখিবার জন্য তাঁহাকে ময়মনসিংহ যাইতে হইল। তথায় তাঁহার খুড়া বীরেশ্বর গুপ্তের বাসায় বসিয়া তিনি একদিন কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় পাঁচদোনানিবাসী কৃষ্ণদাস সেনের পুত্র বসন্তলালকে অন্য ঘরে বসিয়া একখানি বই পড়িতে শুনিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন উহা অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতি। তিনি কয়েক দিনের জন্য গ্রন্থখানি চাহিলেন। বসন্তলাল বলিলেন "আজ স্কুলে ইহার পড়া দিতে হইবে। অতএব স্কুল হইতে আসিয়া আপনাকে বই দিব।" ধর্ম্মনীতি পড়িবার জন্য তাঁহার এমন আগ্রহ জন্মিল যে, উহার আশায় বসিয়া রহিলেন। এবং বসন্তলালের বাসায় আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে রাস্তায় ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা লইলেন ও তাড়াতাড়ি পড়িয়া শেষ করিলেন। ধর্ম্মনীতি তাঁহার খুব ভাল লাগিল, এবং এই প্রকারের আর কোন গ্রন্থ আছে কি না

* কেহ কেহ বলেন শিবমন্দিরে নীরবে মানসপূজায় নিযুক্ত অবস্থায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া একজন তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তিরস্কার করেন। এবং সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞানীর পরিচয় জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়।

জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। শুনিলেন "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক আরও একখানি গ্রন্থ আছে। তিনি উহারও একখানি ক্রয় করিয়া অভিধান ও শ্লেট কিনিয়া শব্দার্থ লিখিয়া উহাও আয়ত্ত করিলেন। সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যের সন্ধানে তাঁহার যে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ময়মনসিংহে তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন কলিকাতায় ব্রহ্মসভা এবং ধর্মসভা নামে দুইটি সভা আছে। আর ব্রহ্মসভার লোকেরাই ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার মন আপনা হইতেই এই ব্রহ্মসভার ও ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উক্ত গ্রন্থ দুই খানি ব্রহ্মসভার হয়, এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্ম-সভা ও ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ।

এই সময় একদিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী মোক্তার গোলক চক্রবর্ত্তীর বাসায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন জগচ্চন্দ্র দাসের মাতুল কুলচন্দ্র গুপ্ত ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুকুরপার দিয়া যাইতেছিলেন। গোলক কুলচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ঐ বেটা ব্রহ্মসভায় গান করে।" ব্রহ্মসভার প্রতি গোলকের মনের ভাবের পরিচয় ভাষাতেই হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন না যাঁহার নিকট এই কথা বলিলেন তিনি ব্রহ্মসভার বিষয় জানিতে কত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। গোলকের কথাতে কালীনারায়ণ বুঝিতে পারিলেন কুলচন্দ্রের নিকট ব্রহ্মসভার সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। তিনি দৌড়াইয়া গিয়া কুলচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সরকারী ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার ভগবানচন্দ্র

বসু মহাশয়ের গৃহে প্রতি বুধবার উপাসনা ও সঙ্গীত হয়, এবং তথায় তিনি গান করেন। আর ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস মাষ্টারের বাসায় এই বিষয়ক পুস্তকাদি পাওয়া যায়। কালীনারায়ণ কুলচন্দ্রকে লইয়া ঈশান বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার আলমারা খোলাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ও সভ্যদিগের বক্তৃতা নামক চারিখানি বই লইলেন ও পরে উহার মূল্য ঈশান বাবুকে দিলেন।

ঐ সকল পুস্তকে তাঁহার মন যাহা চায় তাহারই সায় পাইলেন। বস্তুতঃ এই উপায়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিই আকৃষ্ট হইলেন। এই সময়ে ঐ সকল পুস্তক দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল, উপরি উক্ত ঘটনাদ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

ব্রহ্মসভার বিষয় অবগত হইয়া কালীনারায়ণ পরবর্ত্তী বুধবার ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐদিন মাষ্টার রাধাচরণ বাবু এবং আর দশ বার জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর কালীনারায়ণ নিয়মিত রূপে প্রতি বুধবার ব্রাহ্মসভায় যাইতে ও বাসায় দৈনিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকের স্তোত্রগুলির এক একটি পাঠ করিয়া তাঁহার এই প্রারম্ভিক ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ হইত। এইরূপে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের সূচনা হইল।

"১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ নগরে গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজীশিক্ষার সূত্রপাত হয়। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। ১৮৫৪ সনের ৭ই জানুয়ারী ময়মনসিংহে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের

বাসায় উপাসনা চলিতে থাকে। ভগবান বাবু, ঈশান বাবু, গোবিন্দ বাবু এবং সুয়াপুরনিবাসী ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত সমাজের প্রথম সভ্য ছিলেন। ঢাকার বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিতেন। এবং সমাজের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। আদি সমাজের পদ্ধতি-ক্রমে ব্রহ্মোপাসনা হইত; এবং তত্ত্ব-বোধিনী পাঠ ও রাজা রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য সঙ্গীত গীত হইত।" *

কালীনারায়ণ যখন প্রথম ময়মনসিংহে ব্রহ্মসভায় গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ব্রহ্মসভায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম শুনিয়া কালীনারায়ণ উহার গ্রাহক এবং নিয়মিত পাঠক হইলেন। উক্ত পত্রিকাদ্বারা তাঁহার এবং তাঁহার সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধুগণের ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রভূত সহায়তা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কালীনারায়ণ তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ পড়িয়া আমিষ আহার পরিত্যাগ করেন।

দুর্গোৎসব ও বলি।

গুপ্ত পরিবার শক্তিমন্ত্রের উপাসক। সুতরাং ভাগীরথী দেবীর গৃহে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও ছাগবলি হইত। কিন্তু কালীনারায়ণ ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ ও আমিষ আহার বর্জ্জন করিয়া এই প্রকার অনুষ্ঠানের আর সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি শারদীয় পূজার চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বেই একদিন মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মা, আমি তোমার নিকট একটি ভিক্ষা চাই। যদিও

* শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর হইতে সংগ্রহ।

তুমি আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ, তবু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। পূজায় ছাগবলি বন্ধ করিতে হইবে। বৈষ্ণবেরা বলি না দিয়া পূজা করে, তাহাতে তাহাদের পূজা অসম্পূর্ণ হয় না। শাক্তের পূজা বলির অভাবে কেন না সম্পূর্ণ হইবে? অতএব হিংসা রহিত কর, পূজায় বলি উঠাইয়া দিতে অনুমতি কর।"

সন্তানের প্রার্থনায় যদিও মাতার প্রথমে কিঞ্চিৎ বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তথাপি অবশেষে তিনি অনুমতি দিলেন। কালীনারায়ণ অনুমতি পাইয়াই কাওরাদি কাছারীর নায়েবকে পূজার সময় ছাগ পাঠান বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তদবধি বলি বন্ধ হইল।

ধর্ম্মসাধনে প্রবেশ।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত হইয়া কালীনারায়ণ মন্দিরে সাপ্তাহিক ও গৃহে দৈনিক নির্জ্জন উপাসনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু লোকলজ্জায় কাহারও সম্মুখে কথা বলিয়া উপাসনা করিতে পারিতেন না। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে চুপে চুপে উপাসনা করিতেন। প্রথমতঃ মন স্থির করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। এজন্য এক এক দিন সংকল্প করিতেন আজ সাত মিনিটকাল অনন্য-মনে বসিব। পরদিন হয় ত দশ মিনিট বসিতেন। ক্রমে বার, পনর করিয়া সময়ের বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে অভ্যাসে চঞ্চল মন বশীভূত হইল, উপাসনা মধুর হইতে মধুরতর বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মনামে কি অমৃতের খনি নিহিত আছে তাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ধর্ম্মসাধনার সেই প্রথম উদ্যমে সংসারের সমস্ত চিন্তাশূন্য মনে ঈশ্বরসন্নিধানে উপবেশন করা তাঁহার পক্ষে কিরূপ আরাম ও আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের পথে অগ্রসর হইয়া অনুভব করিলেন—"ব্রহ্মপ্রাণে প্রাণী হইয়া জীবিত অবস্থায় জীবন্ত জীবনে চলাই সত্য ধর্ম্ম, আর ওঁ ব্রহ্মনাম এই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। এই নামকে পরিত্রাণদাতা জানিয়া অনন্ত উল্লাসে জীবনে ভোগিয়া পাইয়া হাস্যকৌতুকে জীবন অতিপাত করাই" * মানব জীবনের লক্ষ্য। ভাটপাড়া-গৃহে, কি ময়মনসিংহে অথবা ঢাকাতে ব্রাহ্মবন্ধুদের মধ্যে কোথাও তাঁহার এই ধর্ম্মসাধনের বিরাম ছিল না।

ধর্ম্মসভার দল।

এই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনার্থীর প্রতি দেশের লোকের অত্যন্ত প্রতিকূল ভাব ছিল। কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলের নানা স্থানেও ব্রহ্মসভার বিরোধীরূপে ধর্ম্মসভার আবির্ভাব হইয়াছিল। ময়মনসিংহেও এই বিরোধীদলের অভাব ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ময়মনসিংহপ্রবাসী গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় স্বয়ং একজন ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের উপর হাড়ে চটা ছিলাম। আমার ভগিনীপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় উক্ত সমাজের একজন সভ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মে। আমি তাঁহার প্রণীত বোধোদয় পুস্তক স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম। আমার ভগিনীপতি আমার ভাবগতি দেখিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "মরুভূমিতে ফুলের বাগান হওয়া বরং

* কালীনারায়ণের স্বলিখিত।

সম্ভব কিন্তু ইহার কঠিন হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।"

দেশবাসী আত্মীয়স্বজন এবং কালীনারায়ণের পালয়িত্রী মাতা ভাগীরথী দেবী সকলেই তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভাগীরথী দেবী সন্তানের ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন এমন নয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলে পুত্রের জাতিভেদ রক্ষা হইবে না, এই আশঙ্কায় তাঁহার মনে বিরোধী ভাব জন্মিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কালীনারায়ণ এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

যবে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে পাতিয়া জীবন,
ব্রহ্মের ধর্ম্মের দিকে করিনু গমন।
কত বাধা কত বিঘ্ন কে না জানে তায়।
এই মা না হ'লে হ'ত ধর্ম্মরক্ষা দায়।
সত্যের মর্য্যাদা মায় করিয়া করিয়া
সত্যেতে পূরিত মার স্নেহময় হিয়া।
তাইত দেখিয়ে মোর ব্রাহ্মধর্ম্মে মতি,
কখনো মা চান নাই ফিরাইতে মতি।
যদিও করেছে মায় শাসন ক্রন্দন,
কেবল আমি ছাড়ি পাছে জাতির বন্ধন। *

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের এই প্রথম অবস্থায় কালীনারায়ণের সম্মুখে কোন প্রবল বাধা বা উৎপীড়ন উপস্থিত হয় নাই। কারণ, তখনকার ব্রাহ্মগণ কেবল ব্রহ্মোপাসনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত জীবনের সকল প্রকার সংস্কারের দিকে তখনও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। এ জন্য অনেকেই

* কালীনারায়ণ-রচিত মাতৃস্মৃতি।
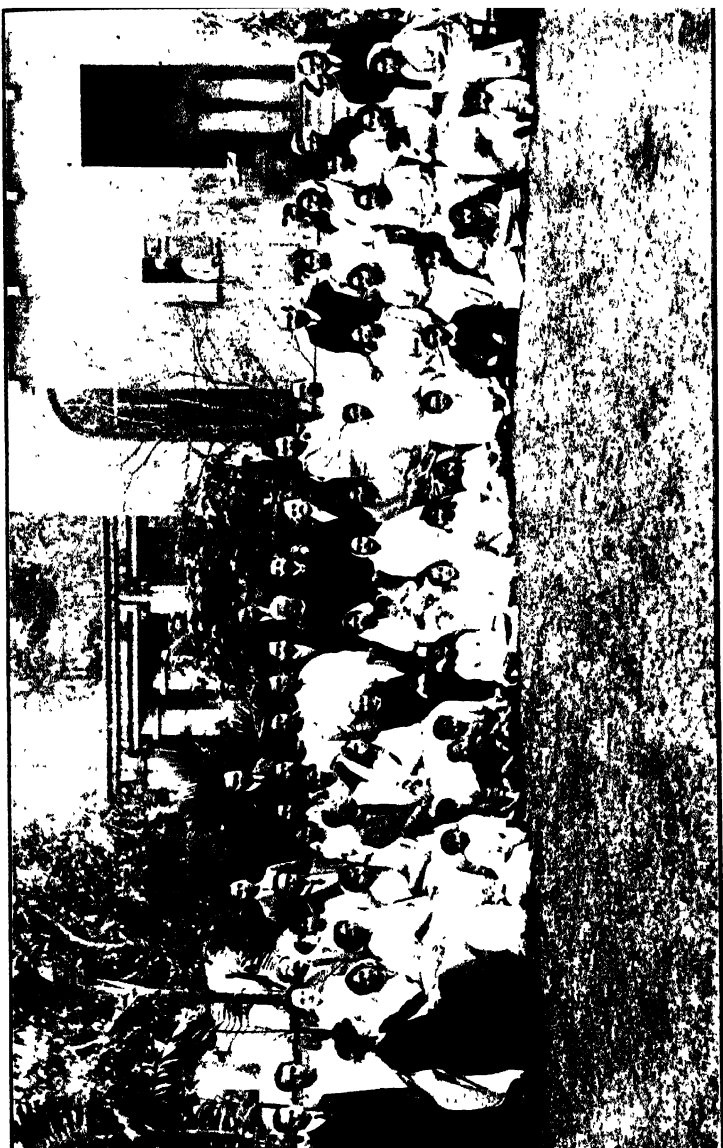
জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিতেন; এবং ব্রহ্মোপাসক হইয়াও তদ্বিপরীত আচরণ করিতেন। ইহার পর জীবনের মূল অনুসন্ধানে ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি পড়িল। ভ্রমকুসংস্কারাদির সঙ্গে সন্ধি করা রহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের প্রবল বাধা উপস্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মগণের সম্মুখে ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তখন কালীনারায়ণকে কিরূপ সামাজিক উৎপীড়ন ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বংশধর।

বাঙ্গলা ১২৪৯ সনে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে কালীনারায়ণের পারিবারিক জীবনের আরম্ভ হয়। ইহার চারিবৎসর পরে তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই শিশুটি অধিক দিন জীবিত ছিল না। তাঁহার ষোলটি সন্তানের ছয়টি এইরূপে শিশুকালেই গত হয়। অপর কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ, বিনয়চন্দ্র পুত্রগণে এবং হেমন্তশশী, সৌদামিনী, চপলা, সরলা, বিমলা, সুবালা কন্যাগণে তাঁহার পরিবার ক্রমে বিস্তৃত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম সময়ে তিনি সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ঢাকা সহরে বাস করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের মেরুদণ্ড বলিলে হয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সকল প্রকার উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

কালীনারায়ণের ভাটপাড়া অবস্থান কালে পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারী-মোহন এবং গঙ্গাগোবিন্দ ঢাকায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তখন পোগোজ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে কালীনারায়ণের পুত্রগণের মনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

সঙ্গতসভা ও সংস্কার।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রথম ঢাকায় আসেন। অঘোরনাথ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্যের এবং গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহদ্ভাব, ঈশ্বরানুরাগ, জনসেবা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। অঘোরনাথের জীবন্ত উপাসনা ও বিজয়কৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় শিক্ষিত যুবকগণের মনে নবীন ভাব প্রবল হইয়াছিল। অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহার পর পোগোজ স্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় দীননাথ সেন ও শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়গণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহারা কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও সঙ্গতসভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সঙ্গতসভাকে ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎস বলা যাইতে পারে। গুপ্তমহাশয়ের পুত্রগণ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই সঙ্গতসভায় প্রবেশ করেন।

ব্রজসুন্দর বাবুর আরমাণিটোলার বাড়ীর এক অংশে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য এবং অপর অংশে সঙ্গতসভার সভ্যগণের বাসস্থান

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণ বঙ্গ বাবুর সঙ্গে এই ছাত্র-মেসে বাস করিতেন।

মেসে অবস্থান কালে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণগোবিন্দ হিন্দুমতে বিবাহ করেন। তাঁহার বয়স তখন ষোল বৎসর এবং পত্নী প্রসন্নতারার এগার বৎসর। সঙ্গতসভার কার্য্যে উক্ত সভার সভ্যগণের তখন এমন উৎসাহ যে তাঁহারা সভার বিবরণ দূরে গৃহে প্রিয়জনকেও লিখিয়া পাঠাইতেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বালিকা পত্নীর আগ্রহে প্রতি সপ্তাহে সঙ্গত সভার বিবরণ পত্নীকে লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। সভ্যগণের প্রতিদিনের জীবনের সংগ্রাম এবং জয়পরাজয়ের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইত তাহা পড়িতে পড়িতে কখন কখন সভায় কান্নার রোল উঠিত। অশ্রুজলে পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইত। এই সব বৃত্তান্ত প্রসন্নতারার কোমল মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া দিত। প্রসন্নতারার গৃহেও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার অনুকূল অবস্থা ছিল। কারণ, তাঁহার শ্বশুর কালীনারায়ণ গৃহে থাকিতেন, আর তিনি পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আচার্য্য কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় বার ঢাকায় আসেন। তথায় তাঁহার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হয়। ঐ সকল বক্তৃতায় হিন্দুসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। যুবকগণের মনে মহৎ সংকল্পের উদয় হয়। সঙ্গতসভার সভ্যগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ জন্মে। সে উৎসাহ তাহাদিগকে সংস্কারে অগ্রসর করে এবং হিন্দু-সমাজের প্রাচীন দুর্গে দারুণ আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের প্রতিও উৎপীড়ন আরম্ভ হয়।

সঙ্গতসভায় এই সময় জালালউদ্দিন মিঞা নামক একজন মুসলমান ছাত্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

জালালউদ্দিনকে সঙ্গতসভায় গ্রহণ করিতে সঙ্গতসভার প্রাচীন ব্রাহ্মগণের ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু উৎসাহশীল যুবক সভ্যদল—যাঁহারা মত ও আচরণের বৈষম্য দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন—তাঁহাদের এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি থাকায় জালালউদ্দিন তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ ও সঙ্গতসভায় প্রবেশ করেন। ইহাতে তিনি ঢাকার মুসলমান সমাজের বিরাগভাজন হন।

সামাজিক আন্দোলন ও উৎপীড়ন।

জালালউদ্দিন আরমাণিটোলার ছাত্রাবাসে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার আহারাদি অন্যত্র হইত। প্রসন্নচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতেন। প্রসন্ন বাবু বাড়ী হইতে বিবাহ করিয়া আসিয়া ছাত্রাবাসের বন্ধুগণের ভোজের আয়োজন করিয়া কৃষ্ণকুমার সেনের উপর নিমন্ত্রণের ভার দিয়াছিলেন। সঙ্গতের সভ্য রূপে তিনি জালালউদ্দিনেরও নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল স্বতন্ত্রস্থানে জালাল উদ্দিনের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে সেরূপ হইল না। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন মহাশয় বলিলেন, আমরা যখন জাতিভেদ মানি না তখন আমরা জালালউদ্দিনের সঙ্গেই আহার করিব। যাঁহাদের ইহাতে আপত্তি আছে তাঁহারা স্বতন্ত্রস্থানে আহার করিতে পারেন। ফলে তাঁহারা এক দল শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারী-মোহন, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি জালাল উদ্দিনের সঙ্গে একত্র আহার করিলেন। এই ঘটনা তাঁহাদের প্রবল মানসিক বলের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা হইতে তাঁহাদের উপর হিন্দুসমাজের ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল।

সমাজের বিরুদ্ধ আচরণ নীরবে সহ্য করিবার অবস্থা তখনও হিন্দুসমাজের জন্মে নাই। এ নিমিত্ত কৃষ্ণকুমার সেন জালাল মিঞার সঙ্গে আহারের কথা প্রচার করিবা মাত্র মহেশ্বরদি পরগণার সর্ব্বত্র আন্দোলন উত্থিত হইল। যাঁহারা জালাল মিঞার সঙ্গে আহার করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই গৃহ মহেশ্বরদি। এই পরগণায় প্রাচীন সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। সুতরাং পাড়ায় পাড়ায় সভা বসিয়া দল পাকিয়া উঠিল। স্থির হইল ইহাদের সকলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, নতুবা একঘরে থাকিবে, ইহাদের ধোপা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ হইবে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, ভুবনমোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, প্যারীমোহন গুপ্ত ইহাঁদের সকলকেই সামাজিক ভাবে বর্জ্জন করা হইল। কালীনারায়ণ জালাল মিঞার সঙ্গে আহারাদি না করিয়াও পুত্রগণের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, তাঁহার প্রতিও সামাজিক উৎপীড়নের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ধর্ম্মোৎসাহী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের সুযোগ হওয়ায় হিন্দুসমাজের উৎপীড়নকে তাঁহার উৎপীড়নই জ্ঞান হইল না। তবে পুত্রস্নেহবিধুরা ভাগীরথী মাতার ক্লেশ দর্শনে মাতৃভক্ত সন্তানের অবশ্যই ক্লেশানুভব হইল। যাহা হউক, কালীনারায়ণ প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন।

সহধর্ম্মিণীর সহযোগিতা।

এই প্রকার সামাজিক গোলযোগে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নদা ভাগীরথী দেবীর সঙ্গে হিন্দুসমাজে থাকিবেন কি স্বামী ও পুত্র-গণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি

শাশুড়ীর সঙ্গে হিন্দুসমমাজে থাকাই স্থির করেন। ইহাতে কালী-নারায়ণ মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ ফল হইয়াছিল, মাতা এবং পত্নীর মন তাঁর মতের অনুকূলে আসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"স্বামী স্ত্রী একাঙ্গ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবে, সতী যেমন এক পতিতে রতা থাকে সেইরূপ পরমপতিকে বরণ করিবে ইহাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম। এই নিমিত্ত স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী।"

এ সম্বন্ধে কালীনারায়ণের নিম্নলিখিত উক্তিগুলিও তাঁহার তৎকালীন অবস্থার পরিচায়ক—"ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রথম মারামারি স্ত্রীকে লইয়া। ব্রাহ্মসমাজের কত বড় বড় লোক পাঁচ সাত বৎসর পরে স্ত্রীকে পাইয়াছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এক ঘণ্টায় সব ফর্সা হইয়াছিল। স্ত্রীকে সঙ্গে না পাইলে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কি করিতে পারিতাম কে জানে?"

পারিবারিক অনুষ্ঠান।

এই সময় ঢাকার ব্রাহ্ম কর্ম্মিগণের অন্যতম ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ধর্ম্মোৎসাহ এবং যোগ্যতা কালীনারায়ণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমন্তশশীর বিবাহ ইঁহার সঙ্গে স্থির করেন। কলিকাতা হইতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় এবং ঢাকার সঙ্গতসভার সভ্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই উপলক্ষে ভাটপাড়া গমন করেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইরূপে গুপ্ত পরিবারে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। গুপ্ত পরিবারে দোল দুর্গোৎসব আদি হিন্দু অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্পন্ন হইত। ক্রমে সে

সকল বন্ধ হইয়া আসিল, এবং দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-পূজার প্রবর্ত্তন ও ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠানাদির আরম্ভ হইল। ইহাতে তিনি গ্রামবাসীর বিরাগভাজন হইলেন। ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া তাহারা তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে তাহারা তাঁহার পারিবারিক দুর্ভোগ অর্থাৎ কন্যাদায় হইতে কিরূপে মুক্ত হন তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহলযুক্ত হইয়া রহিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ হওয়ায় তাহাদের সে বাসনাও ব্যর্থ হইল।

কালীনারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়চন্দ্রের নামকরণ অনুষ্ঠানও ভাটপাড়া গ্রামে ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন করেন। ঢাকা সঙ্গতসভার পরিচালক শ্রীযক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। মাতা ভাগীরথীর এই প্রকার ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে হইতে দিতে একটুও ভাল লাগিত না। কিন্তু সন্তানস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বাধা দিতে পারিতেন না। সময় সময় তাঁহার মনের উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না। বিনয়চন্দ্রের নামকরণ অনুষ্ঠানের উপাসনার পর যখন আহার হইতেছিল তখন তিনি আচার্য্য বঙ্গ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "এইরূপ ব্যাপারের পরেও যে তোমাকে আহার দিতে হইল ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।" এইরূপ কর্ম্মের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠ-পোষকের প্রতি অনাহারে গৃহতাড়নের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই যেন তাঁহার মনের নির্ব্বেদ দূর হইত।

পুত্রের বিদেশে শিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের শিক্ষা ও সংস্কারের যে অবস্থা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সে অবস্থা ছিল না। তখন বিলাতযাত্রা দূষণীয় ও জাতিনাশকর

ছিল। কালীনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশের এই প্রকার সংস্কার মানিয়া চলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পত্নীর অনুমোদন লাভ করায় সহজেই পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দকে শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইতে সমর্থ হন। কৃষ্ণগোবিন্দ অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন। বলাবাহুল্য বিলাতের শিক্ষা তাঁহার ভাবী উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। কালীনারায়ণ পুত্রের বিলাতযাত্রার আয়োজন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ ও অনুমতির জন্য পুত্রকে লইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রহস্য করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বলিয়াছিলেন ;—"বিলাত হইতে আসিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিও না। যদি ঘৃণা কর আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে ঘৃণার স্রোতে ভাসাইয়া দিব।" সুখের বিষয় স্বীয় কর্ম্মগুণেই কৃষ্ণগোবিন্দ দেশের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত গমন করেন, এবং যথাসময়ে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগত ও রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হন।

ধর্ম্মানুরাগ।

কালীনারায়ণ যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন ধর্ম্মসাধনে সর্ব্বদা তাঁহার মনোযোগ ছিল। ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগই তাঁহার কর্ম্মকে নিয়মিত করিত। যখন ভাটপাড়ায় থাকিতেন সর্ব্বদা পত্নীর সহিত ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনাদি করিতেন, যখন ঢাকায় থাকিতেন ঢাকার সঙ্গতসভার অনুরাগীদলের সহিত মিলিতেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন ;—"আমাদের সঙ্গতের আলোচনা রাত্রি বারটা কি

একটায় শেষ হইত। ইহার পর রায়মহাশয় (কালীনারায়ণ) জালাল মিঞাকে লইয়া রমণার মাঠে যাইতেন। তথায় তাঁহাদের সঙ্গীত আলোচনা আরও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মগণের কিরূপ তীব্র অনুরাগ জন্মিয়াছিল ইহাতেই তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।”

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির ও দীক্ষা।

এই সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকসংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমে আরমাণিটোলার গৃহে তাঁহাদের স্থানের অকুলন হইয়া উঠে। এ নিমিত্ত উক্ত সমাজের প্রধান উৎসাহী সভ্য দীননাথ সেন মহাশয় উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্ববাঙ্গলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেকে এক এক মাসের আয় প্রদান করায় মন্দিরনির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। এবং অল্পদিন মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকা ব্যয়ে এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয়। ইহাই বর্ত্তমান পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কার্য্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত ঢাকায় গমন করিয়া মহা সমারোহে কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঢাকার তৎকালীন ধর্ম্মোৎসাহ পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন উপাসনাকালে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট শিক্ষিত যুবকগণের প্রায় চল্লিশ জনের দীক্ষা হয়। কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়, তাঁহার পুত্র প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ এবং ভৃত্য মদন ও গুরুদাসের সঙ্গে একত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতা, পুত্র, প্রভু ভৃত্য মিলিয়া একই আসনে একই আচার্য্যের সমীপে ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, এ দৃশ্য সে দিন বড় মনোরম হইয়াছিল।

তখনকার মধুর ভাব এখন সম্যক্ অনুভব করা কঠিন। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন—"কালীনারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া, প্যারীমোহন খোল ও গঙ্গাগোবিন্দ করতাল বাজাইয়া সকলকে এমন মাতাইয়া তুলিতেন যে, ধরাতলে এক স্বর্গের চিত্র প্রকটিত হইত। সে সময়ের কথা এখন স্মরণ করিলেও শরীর মন পুলকিত হয়।"

প্রচারক্ষেত্রে উৎপীড়ন।

কালীনারায়ণ পূজার সময় কখন কখন সঙ্গীতের দল লইয়া ভাটপাড়ার গৃহে যাইতেন। তাঁহাদের অন্য সরিকের গৃহে পূজা হইত। কিন্তু উহার সঙ্গে এই দলের কোন যোগ ছিল না। তাঁহারা বন্ধুবান্ধব মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিতেন। মাতা ভাগীরথীর বিরাগ, তিরস্কার, গ্রামবাসীর প্রতিবাদ বিরুদ্ধভাব এ সকলের মধ্যেও তাঁহাদের প্রসন্নতার অভাব কি ব্রহ্মপূজার বিরাম ছিল না।

তাঁহার জননীর অসন্তোষ উত্তেজনা সময় সময় এমন উগ্র আকার ধারণ করিত যে, তাহা সহ্য করা কঠিন হইত। একবার কালীনারায়ণ এইরূপ অবস্থায় মায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন, আর মা তাঁহাকে লাথি দিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। কালীনারায়ণ ইহাতেও ক্ষুণ্ন না হইয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বলিলেন—"ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে ঢাকার সঙ্গতের দল লইয়া গুপ্ত মহাশয় মহোদ্যমে আমদিয়া গ্রামে প্রচারযাত্রা করেন। ছুটির সময় তাঁহারা এইরূপে এক এক দিকে যাইতেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার কার্য্য ও জীবন দ্বারা তাঁহার সঙ্গতের ভ্রাতৃগণ এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের জন্য সকল প্রকার ক্লেশ ও নির্য্যাতন অতি তুচ্ছ ব্যাপার। গুপ্ত মহাশয়ের সেবক-সঙ্গী মদন বলিয়াছেন—"ইহাঁরা প্রথম ভাটপাড়া গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে ও পরে আমদিয়া গ্রামে গমন করেন। তথায় নৌকা ঘাটে লাগিলে বালকেরা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অবতরণপথ দুর্গম এবং স্ত্রীলোকেরা কর্দ্দম ও ভাঙ্গা কলসীর কাণা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের নৌকা আক্রমণ করিয়াছিল। গ্রামের পথে কীর্ত্তন বাহির হইলে গ্রামের লোকে পথে বেড়া দিয়া তাঁহাদের গতিপথ রোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া প্রসন্ন মনে গ্রামের পথে পথে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করেন।"

তাঁহাদের উৎসাহ এমনই প্রবল ছিল যে, এ সকল নির্য্যাতনে তাঁহাদের গতিরোধ হয় নাই। বীর সেনাপতির অধীন সেনাদল যেমন সম্মুখ-সমরে কোন বাধা গ্রাহ্য করে না, তেমনি এই প্রচারক দল তাঁহাদের মহান্ সেনাপতির নির্দ্দেশে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন—"ঢাকার প্রচারকদল একবার শারদীয় অবকাশ সময়ে ত্রিপুরার কালিকচ্ছ গ্রামে গমন করেন। তথাকার আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাস-চন্দ্র নন্দী তাঁহাদের দলে ছিলেন। তাঁহারা পূজার বন্ধে বাটীতে গিয়া ষষ্ঠী কি সপ্তমী পূজার দিন দুর্গামণ্ডপে ব্রহ্মপূজার আয়োজন করেন। ইহাতে গ্রামবাসীর মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা জন্মে। একদল লোক লাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য একত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম-গণের মুখে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন শুনিয়া অবশেষে তাহাদের পরিবর্ত্তন

ঘটে ও কীর্ত্তনে অশ্রুপাত করিয়া ব্রাহ্মগণের কীর্ত্তনে মিলিত হয়। গুপ্ত মহাশয় বন্ধুগণের পত্রে এই বিবরণ জানিয়া একটি গীত রচনা করিয়া বন্ধুগণের প্রচারক্ষেত্রের সফলতা ও হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করেন। ঐ গীতের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ব্রহ্মনামের তোপ তাগিয়ে মহিম ফতে কর ভাই,
যত দেখ কিল্লাবন্দী পুড়ে ধুরে হবে ছাই।
বিশ্বাস-বারুদ পূরিয়ে, প্রেমের সলায় গাঁজ তাই,
তুমি নয়ন মুদে দেও রে আগুন, চেয়ে দেখ্‌বে কিছু নাই।"

ব্রহ্মনামের তোপের সাহায্যে ও বিশ্বাস-বারুদের বলে ব্রাহ্ম সেনাদল দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় পূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস ও প্রেমের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডিন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পরিজনসহ ঢাকায়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে নির্ব্বাহ হওয়ায় হিন্দুসমাজ কালীনারায়ণকে বর্জ্জন করিল। ইহাতে নানাপ্রকার অসুবিধায় গ্রামে বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি পুত্র ও কন্যাগণের শিক্ষার জন্য নিজকে তুল্য রূপে দায়ী মনে করিতেন। পুত্রগণের বিদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। কন্যাগণের শিক্ষার জন্য গ্রামে যে বালিকাবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা তথায় ছিল না। সুতরাং কন্যাগণের শিক্ষার জন্য বিদেশে বাস করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাগণকে লইয়া গ্রামে বাস করিলে

অধিকতর গঞ্জনার কারণ হইবে ভাবিয়া তাঁহার মাতা উদ্বিগ্না হন। এই সব নানা কারণে কালীনারায়ণ সপরিবারে ঢাকা বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতা গ্রামে বাস করিলেও সন্তান ও জননীর মধ্যে যে প্রবল ভালবাসার আকর্ষণ ছিল তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। মাতা কখনও পুত্রের নিকট ঢাকা আসিতেন, পুত্র কখনও মার নিকট গ্রামে যাইতেন। এইরূপে তাঁহাদের উভয়ের ভালবাসার চরিতার্থতা হইত।

বিশ্বাসীর ভবিষ্যত।

যদিও বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাগণের বিবাহের চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই কালীনারায়ণের মনে উপস্থিত হইয়াছিল, তবু এই প্রকার চিন্তায় কখনও তাঁহাকে অভিভূত দেখা যায় নাই। অনেকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "রায় মহাশয়, মেয়েদের বিবাহের কি করিতেছেন ?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিতেন "জন্ম, মৃত্যু. বিবাহ তিনই বিধির নির্ব্বাহ। ইহাতে মানুষের হাত নাই। যখন ভগবান জুটাইবেন তখনই জামাতা পাইব, আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিতে পারি ?"

"ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার কন্যাগণের সকলেরই উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইল। তাঁহার জামাতাভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। দৈব নির্ব্বন্ধে অযাচিত ভাবে তাঁহার তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার স্বজাতিতে বিবাহ হওয়াতে তাঁহার মাতা পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ধর্ম্মে বিবাহ নাই বলিয়াই আমার এক মহা আতঙ্ক ছিল। তাহাতে আবার স্বজাতিতে বিবাহ ত আমার একেবারে স্বপ্ন বুদ্ধির অগোচর। এমন সকল নাত্‌জামাই, নাত্‌বৌ আমি সহস্র টাকা ঢালিয়াও

আমাদের সমাজে পাইতাম না। বিধর্ম্মী হইয়াছ তাহাতে আমার দুঃখ নাই, বিভিন্ন নামে সকলেই একজনকে ডাকে। তবে আর তোমার আমার ধর্ম্ম প্রভেদ কি?" মায়ের মনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র দেখিলেন সকলই সেই পরম কর্ত্তার ইচ্ছা। তাই মায়ের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "মা গো, আপনি তুষ্ট থাকিলেই আমার সকল সার্থক।" তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার পরিবারের এই প্রকার সকল দিকের অনুকূল অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন পুণ্যবান পুরুষের অনিষ্টসাধন মানুষের সাধ্যাতীত।" *

পারিবারিক এবং সামাজিক ধর্ম্মসাধনে পত্নীর সাহচর্য্য লাভ করিয়া কালীনারায়ণ ঈশ্বরে একান্ত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশে এই কৃতজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে:—

"স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন বলিয়া শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ ও প্যারী বিলাত যাইয়া ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছে। এবং অন্যান্য পরিবারে কন্যা জামাতাগণ কত শুভানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছে ও উপাসনাদি করিয়া পুণ্যবান হইয়াছে। আর সেই স্ফূর্ত্তিতে সমস্বরে ওঁ ব্রহ্মধ্বনি পূর্ব্বক প্রাণব্রহ্মের জয়ঘোষণা করিয়াছি ও করিতেছি।

"প্রাণব্রহ্ম তাঁহার দেহ বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মলিন থাকিতে দেন না। যখন খুব অন্ধকার তখনই ফর্সা। তিনি মুক্ত হস্তে শক্তি বিধান করিতে করিতে লইয়া চলিয়াছেন। কোথায় লইয়া যাইবেন কিছু বলেন না। কিন্তু দিনে দিনে যে পবিত্রতার দিক ফুটিতেছে তাহা দেখিয়া মহা আশায় বুক বাঁধিয়াছি। আত্মাতেই ব্রহ্মজ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়াছেন, তাই অন্ধকার হইতে যে আলোকে যাইতেছি, অসত্য

* শ্রীযুক্তা বিমলাদাস রচিত পিতৃস্মৃতি।

হইতে যে সত্যে গমন করিতেছি, মৃত্যু হইতে যে অমৃতে যাইতেছি, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া দিনে দিনে নবীন রাজ্যে নবীন সুখে অমর হইতেছি। আমি কি জগৎ যদিও কিছু বলিয়া দেখি না, কিন্তু খড় কুটা যেমন প্রথম অগ্নি জ্বালে, এরূপ আমি-কিছু-না দ্বারা কত কিছু করিতেছেন তাহা অপার অগম্য। তাই ভাবি আমি কিছু না। অন্যত্র সব কিছু। হায়, কি মায়া তোমার, কি জানি তার! আমরা নিন্দা করি, প্রশংসা করি। কবির কহিয়াছেন—

"কিছ্‌কো নিন্দো, কিছ্‌কে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।"

অতএব আমি যেমন আমাকে পরম সুখী মনে করি, তেমনি জগতের প্রতি নরনারী তোমাদ্বারা সুখী ও কর্ম্মণ্য। কেহই অবহেলার নহে।

"তোমার দেহে আহার, তাহার কার্য্যে সব ষোল আনা সব সমান, এই সমানই মান বা পরিমাণ।" ইহাও প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করি। সকলই তোমার কাজের যন্ত্র। যাহার দ্বারা যে কার্য্য করাইবে তাহাই হইবে ও হইতেছে। আমি ঘৃণা বা নিন্দা করিলে কি হইবে? প্রাণ, তুমি ত ঘৃণা কর না। আমার যাহা কার্য্যে লাগে না তাহা আমি ভাল-বাসি না, বা বৃথা বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রাণ, তোমার ত সব লাগে। আমি তাঁতির তাঁতে একটি শম্বুক দেখিয়া বৃথা মনে করিতে পারি, কিন্তু কাজের সময় দেখি সেই শম্বুকের প্রয়োজন আছে। মাকুতে তেল দিয়া তাহাকে সচল করিবার পক্ষে ঐ শম্বুকের কত প্রয়োজন!

"না বুঝি' তোমার কার্য্য কত নিন্দা করি,
না শুনি' তোমার বাক্য হাঁফাইয়া মরি।"

স্ত্রী মহাশয় আমার এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের নিত্য সহায় ছিলেন।"*

---

* গুপ্ত মহাশয়ের নিজের লিখিত খাতা হইতে উদ্ধৃত।

পত্নীকে সঙ্গিনী না পাইলে যেমন ধর্ম্মসাধনে, তেমনি তাঁহার সাংসারিক উন্নতির পথেও, কত অন্তরায়ের সম্ভাবনা ছিল! পত্নীর প্রতিকূলতায় পুত্রগণের বিলাতযাত্রায় বাধা জন্মিলে তাঁহাদের উচ্চপদ, সম্মান, মর্য্যাদা, এ সকলও হয়ত অন্য আকার ধারণ করিত। যাহা হউক, পত্নীর সহায়তা তিনি সকল দিকেই অনুভব করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার আধ্যাত্মিক এবং পারিবারিক সকল উন্নতির মূল, ইহা অনুভব করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে দৃঢ় ভাবে ধরিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মকে তিনি মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য এই ধর্ম্ম সাধনে ও প্রচারে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল।

ঢাকায় অবস্থান কালে অনেক সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়া এবং ভাবসঙ্গীত রচনা ও গান করিয়া, সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগের ও প্রচারোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ভাবুক লোক ছিলেন; তাঁহার মুখে কোন দিন যাঁহারা ভাবসঙ্গীত শুনিয়াছেন তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। তাঁহার কণ্ঠে ব্রহ্মনামকীর্ত্তন শুনিয়া শ্রোতাদের হৃদয় একেবারে গলিয়া যাইত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ বশতঃ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কাওরাদি নামক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার

চেষ্টায় সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও সরল ভাব প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। কাওরাদিকে তিনি তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র, প্রচারক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সনের ২০শে চৈত্র কতিপয় বন্ধুকে লইয়া তথায় সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার কর্ম্মচারী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কালী কবিরাজ এবং আরও দুই চারি জন বন্ধু উপাসনায় আসিতেন। জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাওরাদির দুই তিন মাইল দূরস্থ জয়ধরখালি পাঠশালায় শিক্ষক ছিলেন। তিনিও প্রতি রবিবার আসিয়া যোগ দিতেন। গুপ্ত মহাশয় ঐ পাঠশালায় সাহায্য করিতেন ও মাঝে মাঝে পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া বালকদের পুরস্কার দিতেন। এই রূপে সাধারণের শিক্ষানুরাগবৃদ্ধিরও চেষ্টা করিতেন।

উক্ত জয়চন্দ্র হিন্দুসমাজে ছিলেন। কিন্তু কালীনারায়ণের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কালীনারায়ণের নিষ্ঠা, সাধুতা, পরোপকার এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মোপাসনায় অনুরাগ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কালীনারায়ণের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি উপাসনায় যাপন করিতেন। এবং তাঁহার এমন ব্যাকুলতা ছিল যে উপাসনার সময়ে বালকের ন্যায় কাঁদিতেন।"

কাওরাদির অধিকাংশ স্থান সে সময়ে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; লোক জনের বসতি অধিক ছিল না। জঙ্গলগুলি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান বলিয়া দুর্গম ছিল। একাকী পথ চলিতে লোকের মনে ত্রাস জন্মিত। ঢাকা ও ময়মনসিংহের রেলপথ তখনও হয় নাই। তদবধি গুপ্ত মহাশয় মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন, এবং কতকদিন করিয়া থাকিতেন। কখনও বা দুই চারি জন বন্ধুসহ, কখনও বা একাকী নির্জ্জন উপাসনায় ও ধ্যানে তাঁহার গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত।

এই ভাবে অনেকদিন গত হইল। পরে ১২৮৫ সনে তথায় মাঘোৎসব করিলেন। গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্রহ্মোৎসব এক নূতন ভাবের উদয় করিল। তদবধি প্রতিবৎসর উৎসব হইত। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রার্থনা হইত। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে কালীনারায়ণ ভাবের সহিত বক্তৃতা করিতেন। চতুর্দ্দিকের গ্রামের লোক দলে দলে আসিয়া উৎসবে যোগ দিত। নামে রুচি এবং জীবের প্রতি দয়া সম্বন্ধে তিনি হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দিতেন। স্বরচিত ভাবসঙ্গীত গান করিয়া লোকদের মন এমন আকর্ষণ করিতেন যে, ক্রমে অনেকে তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত হইল। মাধব মিস্ত্রী, শম্ভু বাউল, হারাণ সাহা, মদন বেপারী, কুদ্রতুল্যা মুন্সী, বামাচরণ চন্দ প্রভৃতি সাধারণ গৃহস্থ তাঁহার সঙ্গীদলে মিলিত হইলেন। মাধব মিস্ত্রীর কাঠের কাজ সামান্য রকমই জানা ছিল। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের সংসর্গে আসিয়া এই কার্য্যে তাঁহার নিপুণতা জন্মিয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় সকল প্রকার কর্ম্মেই সুনিপুণ ছিলেন। এজন্য সকলেরই তাঁহার নিকট শিখিবার ছিল।

মাঘোৎসবে যাহারা একত্র হইত, তিনি তাহাদের আহার করাইতেন। অন্ধ, আতুর, দরিদ্র যাহারা আসিত, অবস্থানুসারে তাহাদিগকে টাকা, পয়সা, শীতবস্ত্র, চাউল ইত্যাদি দিতেন। আত্মীয় বন্ধু কর্ম্মচারী সকলকে নূতন বস্ত্র দিতেন। সময় সময় মণ্ডলীভুক্ত লোকদের বাড়ীর মেয়েদেরও আহারে নিমন্ত্রণ করিতেন। নিরুপায় দরিদ্র, অসমর্থ রোগীদিগকে ঔষধাদি বিতরণ করিতেন। এই সকল কর্ম্মদ্বারা তিনি তাঁহার এই প্রচারক্ষেত্রে একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ আচার্য্য তাঁহার কাওরাদির একটি সঙ্গী। তিনি

কালীনারায়ণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছি; "আমার মা আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমার এই অন্ধ পুত্রটির চক্ষু দান করুন'। তাঁহাকে ঔষধ বিতরণ করিতে দেখিয়া আমার মা তাঁহার নিকট চক্ষুর ঔষধের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট চক্ষুর ঔষধ ছিল না। তবে আমাদের দুঃখ ও অভাব জানিয়া অর্থ ও বস্ত্র দিয়াছিলেন। তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ছয়টি টাকা ও দুইখানি বস্ত্র দিতেন। এইরূপ সাহায্য অনেক লোকই পাইত। যাহারা অচল, তাঁহার নিকট আসিতে অক্ষম ছিল, তিনি অনুসন্ধান করিয়া তাহাদেরও সাহায্য করিতেন। প্রথমে ভাবিতাম তিনি ত আমাদের আত্মীয় নন তবু কেন এসব করেন। শেষে বুঝিলাম তিনি যথার্থই আমাদের মত দুঃখীর আত্মীয় ছিলেন।

"এই প্রকার উপকার পাইয়াও আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহা হইতে দূরে আমোদ প্রমোদে ডুবিয়া ছিলাম। অবশেষে একদিন তাঁহার আদর ও স্নেহে আকৃষ্ট এবং কীর্ত্তন শুনিয়া আপনাকে ধরা দিলাম। আমার সঙ্গে আরও একটি লোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল। সে-দিনের কীর্ত্তনে আমার মন গলিয়া গিয়াছিল, এবং আমি আমাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। যে কয়েকটি গান হইল তার একটির প্রথম চরণ এই রূপ—"(মন) পাগল যদি হবি পাবে সেই ধনে, সে পাগলে পাগল হ'তে লয় না কি রে মনে?" কীর্ত্তন করিয়া আমার মন সত্যই পাগল হইয়াছিল।

"আর একটি গানের প্রথম চরণ এইরূপ—"দয়াল দয়াল চাঁদবদনে বল, (ওরে) রসনায় না নিলে নাম বদনে কি ফল?" এই গান গাহিয়া আমরা আমাদের রসনা সার্থক করিয়াছিলাম। চক্ষুরোগের জন্মীয়

ঔষধ তাঁর নিকট পাই নাই, কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই ; কারণ, তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তনের মধুর ভাবের মধ্য দিয়া জ্ঞানচক্ষু লাভের যে সন্ধান পাইয়াছি, তাহার জন্য শতমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও শেষ হয় না।

"ঐ দিন কীর্ত্তনে আমাদের প্রায় সমস্ত রাত্রি গত হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে আমরা একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁর এমনই উৎসাহ যে, প্রত্যূষ হইতে না হইতেই তানপুরা লইয়া গান ধরিলেন :—

"এবে জাগ সকলে, অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান পাপতাপহারী।"

আমরা ত জাগিয়াই ছিলাম ; তাঁহার প্রাভাতিক গান শুনিয়া তাঁহার কণ্ঠের সঙ্গে আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া দিলাম। সংকীর্ত্তনে যেন সুধা বর্ষণ হইতে লাগিল। এই রূপে দুই তিন দিন আমরা তাঁহার সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে যাপন করিয়া গৃহে আসিলাম।"

তাঁহার অন্যতম সঙ্গী কাওরাদিনিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্য বলিয়াছেন--"পিতার নিকট মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের কথা শুনিয়া এবং সাধুসঙ্গ করিয়া সেই উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য জানিতে হয় শুনিয়া অবধি সত্য ধর্ম্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগ্রত হয়। পিতা বলিয়াছিলেন—"আমি দীর্ঘদিন শিব পূজা করিয়া দেখিলাম তাহাতে মনের পরিবর্ত্তন হয় না, মন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় ও সাধুসঙ্গ আবশ্যক। কিন্তু এ অঞ্চলে সত্যদ্রষ্টা সাধু লোকের অভাব। অতএব তুমি আত্মদর্শী সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ গ্রহণ কর।" পরে গুপ্ত মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে আমি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করি। তিনি উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "ভগবানের কৃপা সম্বল করিয়া প্রার্থনা কর, অবশ্য প্রকৃত পথ পাইবে"।

পরে ধীরে ধীরে উপাসনায় প্রবেশ করিলাম, প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলাম।"

গুপ্তমহাশয় প্রথমে মাঘোৎসব অল্প কয়েক দিনেই শেষ করিতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎসবের সময়ের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১১ই মাঘের পর মাস ভরিয়া উৎসব হইত। উৎসবান্তে একদিন মিলনোৎসব করিতেন। ইহারও পরে কেবল মাঘোৎসব নয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করিতেন। সজনে, নির্জ্জনে, নৌকায়, জঙ্গলে, নানা স্থানে নানা ভাবে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া নিজে মাতিতেন এবং সঙ্গীদলকে মাতাইতেন। সে সকলের সুখস্মৃতি সঙ্গীদল এখনও রক্ষা করিতেছেন।

সময় সময় নির্জ্জন বনস্থলীর উপাসনায় তাঁহার সহিত বহু লোক একত্র হইত। যাত্রাপথে যদি কাহারও মস্তক ছত্রশূন্য দেখিতেন, নিজের মাথার ছাতি ঘরে রাখিয়া যাইতেন। যেন সকলের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া দিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেন। কখনও গভীর বনের বৃক্ষচ্ছায়া, কখনও জলাশয়ের তীরে মনোরম স্থান উপাসনার জন্য নির্ব্বাচন করিতেন। তথায় নানা প্রকার বনফুলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে এবং নির্জ্জনতার মাধুর্য্যে ও বিহগকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতে উপাসনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইত; ভাবসঙ্গীত এবং প্রীতি-ভোজনে বনস্থল উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইত।

একবার এক জঙ্গলে গিয়া বলিলেন, "তোমাদের যার যেখানে ইচ্ছা বসিয়া উপাসনা কর।" ইহাতে এক এক জন এক এক দিকে গিয়া ব্যক্তিগত ধ্যান ও প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলেন। কেহ বৃক্ষতলে, কেহ ঝোপের আড়ালে আপন মনে বসিয়া গেলেন। কাহারও প্রার্থনা "দয়াময়, অন্ধকে দেখা দাও", কাহারও "প্রভু, আমার পাপ তাপ দূর

কর।” এই রূপে অনেকক্ষণ কাটাইয়া সকলকে লইয়া আবার আলোচনা ও কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সময় সময় শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। জননী যেমন সন্তানসন্ততিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করে, তেমনি এই বৃক্ষমাতা যেন ব্যাকুল আত্মাগণকে লইয়া ব্রহ্মগুণ কীর্ত্তনে মধুর আনন্দ ভোগ করিতেছে, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইতেন এবং আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ কীর্ত্তনে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ বন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেন।

কখন কখন নিকটবর্ত্তী ধামচুর গ্রামে কাছারীতে সদলে উৎসব করিতে যাইতেন। একবার মল্লিকবাড়ীর বাজারে কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সন্ধ্যাকালে ধামচুর যাত্রা করিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল, এবং অন্ধকারে জঙ্গলে পথ হারাইয়া অনেক ঘুরিলেন; পরে শুষ্ক পত্ররাশিদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া উহার চতুর্দ্দিকে—“তরু বল্‌রে বল্‌, কে তোরে সাজাইল দিয়ে পত্র পুষ্প ফল” গান করিলেন। তাঁহাদের গানে বন প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, দূরস্থ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

কেবল ধর্ম্মোপদেশেই তাঁহার প্রচারক্ষেত্রের কর্ত্তব্য শেষ হইত না। নানা প্রকারে লোকের উপকার করিতেন। একবার এক গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। তিনি দল বল সহ প্রাণপণে আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন একখানি ঘরও বাঁচাইতে পারিলেন না, তখন সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি ঘরের মূল্য দিলেন।

একবার গফরগাঁও হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাওরাদি

যাইতেছিলেন। পথে রেলে পা পিছলাইয়া তিনি গুরুতর আঘাত পাইলেন। তাঁহার হাতের তানপুরা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ এবং হাঁটু কাটিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু তবু গান করিতে বা পথ চলিতে নিরস্ত হইলেন না। "ব্রহ্মনামসুধা সদা রে ও মন, পান কর" তখন এই গান হইতেছিল। গানের ভাবে শরীরের ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই সকলকে বলিলেন "আমি বিশেষ কষ্ট পাই নাই, তোমরা গানটি গাও, ছাড়িয়া দিও না।"

গফরগাঁও হইতে কাওরাদি ৯ মাইল। এতটা পথ আসিয়া সকলেরই ক্লান্তি জন্মিয়াছিল। পরের দিন আর কীর্ত্তন হইবে না, বিশ্রাম পাওয়া যাইবে, সঙ্গীদল এরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের নিকট এই প্রকার কার্য্যে আদৌ শ্রমবোধ ছিল না। এজন্য পরদিনও রাত্রি দুই দণ্ড থাকিতেই সকলকে উষাকীর্ত্তনে আহ্বান করিলেন। এবং সমবেত সকলকে লইয়া প্রবল উদ্যমে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একবার দত্তেরবাজার হাটে প্রচারে গিয়াছিলেন। এই স্থান কাওরাদি হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। তথায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল।

অনেক সময় নৌকা করিয়া প্রচারযাত্রা করিতেন, সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং পাচক ব্রাহ্মণ লইতেন। কিন্তু আদর যত্নের সহিত কোথাও আহারের অনুরোধ হইলে তাহা উপেক্ষা করিতেন না। হিন্দু মুসলমানের বিচার না করিয়া সকলের অনুরোধই শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিতেন। ভক্তিভাবে কেহ একটু সামান্য খাবার, এমন কি একটি ফল দিলে, তাহাও সাদরে গ্রহণ করিতেন, এবং সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন।

একবার এক ফকির অকালে একটি আম দিয়াছিল। তিনি আমটি লইয়া দলের সকলকে আমের উৎসর্গে আহ্বান করিলেন, এবং সকলে সমবেত হইলে প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—"আমের গাছে রস নাই, ইহার পাতায়, বাকলেও রস নাই। কাঁচা আমের মধ্যেও রস ছিল না। কিন্তু দাতা পরব্রহ্ম, তুমি আশ্চর্য্য উপায়ে এই সুপক্ক আমে সুরস ঢালিয়া দিয়াছ। আমাদের পরিতৃপ্তির জন্য তোমার এই অপূর্ব্ব আয়োজন। তোমার আয়োজনের প্রতি নেত্রপাত করিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। অতএব আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া এই আম গ্রহণ করিতেছি।"

ইহার পর আমটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এইরূপে কৃতজ্ঞতাভরে অশ্রুপাত করিয়া আমের উৎসর্গব্যাপার সম্পন্ন হইল।

একবার উৎসবের পর নান্দিনা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন হয়। গ্রামবাসীরা চিড়া, মুড়ি, দৈ, বাতাসা দিয়া তাঁহাদের ফলার করাইয়াছিল। এই দিন রাধারমণ বাবাজীর আখড়ায় সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করেন। "ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে" এই গানে সকলের মন মাতিয়া উঠিয়াছিল।

ঐ দিন প্রভাতে নদীর পরপারে বাজারে খুব কীর্ত্তন হয়, দোকানের লোকেরা প্রচুর বাতাসা ছড়াইয়া হরিলুট দিয়াছিল। ঐ সময় একটি বালক নিশানহাতে কীর্ত্তনের অগ্রে যাইতেছিল। কোন্ দিকে কোথায় যাইতে হইবে বালকের প্রতি সেরূপ কোন আদেশ ছিল না। তার যে দিক ইচ্ছা যাইতেছিল এবং কীর্ত্তনের দল সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। বালক অবশেষে এক বেশ্যাপল্লীতে প্রবেশ করিল। কেহ কেহ নিষেধ করিলে গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,

"ব্রহ্মই আমাদিগকে এদিকে আনিয়াছেন।" এই বলিয়া বেশ্যা-পল্লীতে প্রমত্ত কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনান্তে বেশ্যাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"পাপ পুরুষেরা নানা কুমন্ত্রণায় তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে। তোমাদের সম্পূর্ণ দোষ নয়। এখন এ ব্যবসায় ছাড়, জাতিতে উঠ, এবং পাপতাপহারী অকূলের কাণ্ডারী ব্রহ্মকে স্মরণ কর ও একনিষ্ঠ হইয়া বাস কর। ব্রহ্ম দয়া করিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।"

তিনি অনেক সময় বলিতেন "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" বারাঙ্গনাদের নিকট ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তিনি কথার অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

গ্রাম্য লোকেরা কীর্ত্তনে খুব বাতাসা লুট দেয়, আর যাহারা গান করে তাহাদের অনেকে ছুটিয়া গিয়া এই বাতাসা কুড়াইয়া থাকে। গুপ্ত মহাশয় ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া "(মন) লুট রে সংসারের মজা ব্রহ্মনাম অমূল্য রতন" এই গানটি রচনা করেন।

ভাটপাড়ার নিকটবর্ত্তী সুনর গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি মাতার নামে ভাগীরথী-সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ খননেও জল না দেখিয়া সকলের মনে নিরাশা জন্মিলে, গুপ্ত মহাশয় বিশ্বাসের সহিত দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন, "মার নামে সরোবর, ইহা ব্যর্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মের দয়ায় অবশ্যই জল উঠিবে।" এই বলিয়া সমস্ত রাত্রি পুকুরপাড়ে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া যাপন করিলেন। পরদিন দেখা গেল পুকুরে জল উঠিয়াছে। ব্রহ্মনামে তাঁহার এমনই বিশ্বাস ছিল। *

একবার প্রচার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ গমন করেন। তথায় নিজে

* শ্রীযুক্তা সরলা দাস কথিত।

খোল লইয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উৎসাহ আগ্রহে ক্রমে লোকদল আসিয়া জুটিলে "(ও ভাই) শুন রে সুখের সমাচার, কর জীবে দয়া নামে ভক্তি সারাৎসার।" এই গান হইল। মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী গানে আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গমন করিয়াছিলেন।

একবার সদলে বরিশাল যাত্রা করেন। তথায় মন্দিরে, পল্লীতে, অশ্বিনী বাবুর গৃহে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। অশ্বিনী বাবুর গৃহে "বেচে থাক পরাণ-ব্রহ্ম" এই গান করেন। গানে সুন্দর বাৎসল্য ভাবের পরিচয় পাইয়া অশ্বিনী বাবু অত্যন্ত মুগ্ধ হন। গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনায়ও প্রায়ই বলিতেন "প্রভু, তুমি সুখে থাক, তোমার সুখে আমরা সুখী।" ইষ্ট দেবতার প্রতি এই প্রকার বাৎসল্য ভাব বড়ই সুন্দর ও উচ্চ। "বেঁচে থাক, পরাণ-ব্রহ্ম" গীতটিতেও বাৎসল্য ভাবের সুন্দর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্র বাৎসল্য ভাবের অনেক উচ্চে স্থান দিয়াছেন। উহাতে ভগবানকে বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ এবং যশোদাকে তাঁহার সেবায় ও স্নেহদানে নিয়োজিত করা হইয়াছে। সাধকমাতা ভগবান-সন্তানের সেবা করিয়া কৃতার্থা হইতেছেন। মা যেমন সন্তানের সেবা না করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না, সন্তানের সেবাতেই তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান হয়, সাধক-মাতারও তেমনি ভগবানের সেবাতে জীবনের সার্থকতা। ভগবানে অহেতুকী ভালবাসা না জন্মিলে এমন ভাব কখনও হইতে পারে না। গুপ্ত মহাশয়ের গানে এবং প্রার্থনায় এই প্রকার বাৎসল্য ভাব তাঁহার সাধকজীবনেরই পরিচয় দেয়।

একবার রসুলপুর গ্রামে প্রচারযাত্রাকালে পথে একটি গরীব

মুসলমানের অনুরোধে তাঁহার গৃহে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের অবতারণা করেন। এই ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিয়া তিনি তাঁহাকে কয়েকটি টাকা সাহায্য করেন।

পরে রছুলপুরের নদী পার হইয়া তাঁহারা দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে আরম্ভ করেন। চলিতে চলিতে ক্ষুধায় সকলেরই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। একজন ক্ষুধার উল্লেখ করিলে গুপ্ত মহাশয় বলিলেন—"এখানে ত কোন দোকান নাই, কিরূপে ক্ষুধার প্রতিবিধান হইবে? তবে ভগবানের দয়া হইলে সকলই সম্ভব হয়। এমন কি এই শূন্য নদীতীরেও আহার মিলিতে পারে।" কথা শেষ হইতে না হইতে এক মুড়িওয়ালীকে নদী পার হইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিলেন। পরে তাঁহারা মুড়ি কিনিয়া জলযোগের আয়োজন করিবেন এমন সময় একজন পথিকের এই কথা শুনিতে পাইলেন, "লবণ আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম, কিন্তু লবণ না আনিয়া গুড় আনিয়াছে।" শুনিয়া তাঁহাদের একজন বলিলেন—"তবে পয়সা লইয়া আমাদিগকে ঐ গুড় দিতে পার।" সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে গুড় দিল। গুড়মুড়ি দিয়া তাঁহাদের সুন্দর জলযোগ হইল।

রছুলপুরে কীর্ত্তন উপাসনা করিয়া তাঁহারা শিবগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তথায় রাত্রিতে 'আধ্যাত্মিক মহাজন' এই বিষয়ে বক্তৃতা হইল। এখানে বাজারে যে সকল ব্যবসায়ী মহাজন বাস করিত তাহারা সকলে তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়াছিল। বলিলেন, "যাহারা অধ্যাত্মরাজ্যের সত্য বহন করিয়া আনেন তাঁহারাই আধ্যাত্মিক মহাজন। নানক, মহম্মদ, খৃষ্ট ইত্যাদি জগতের সাধুগণ আধ্যাত্মিক মহাজন। ইঁহারা লোকের নিকট সত্যধর্ম্ম বহন করিয়া আনিয়া-

ছিলেন। ইঁহারাই যথার্থ মহাজনের কাজ করিয়াছেন। দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইয়াছে। ব্যবসায়ের সঙ্গে সত্যের যতই যোগ হয়, ততই ব্যবসায়ের সফলতা, এবং জীবনেরও ইহাতেই সার্থকতা। সত্যের ব্যবহার করিতে করিতেই এই মহাজন সেই মহাজন হইতে পারে। নানকও মহম্মদ উভয়ে সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়ে সত্যের ব্যবহার করিতে করিতেই শেষে অধ্যাত্মরাজ্যের ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। তখন শত শত নরনারী তাঁহাদের উপদেশে পরিত্রাণের পথে আগমন করিয়াছিল।"

কাওরাদি গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হওয়া অবধি বহুদিন একখানি খড়ের ঘরে উপাসনা ও উৎসবাদি হইত। একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এইরূপ ব্রহ্মোপাসনা স্থায়ীরূপে রক্ষা করিতে হইলে একখানি ইষ্টকগৃহের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ায়, তিনি ১২৯৯ সনে পাকা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে ১৩০০ সনের ২০শে চৈত্র গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উৎসব হয়। তাঁহার আহ্বানে নানা স্থানের ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া উৎসব ভোগ করেন। ঐ দিন প্রাতে সমবেত উপাসকমণ্ডলী পুরাতন গৃহ হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলে গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনা, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ ও গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নদা গুপ্তা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উপাসনা করেন। উপাসনান্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপদেশ দান ও গুপ্ত মহাশয় স্বীয় জীবনে ভগবৎকৃপার সাক্ষ্যদান, কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাওরাদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন।

১৩০৩ সনে গুপ্ত মহাশয় নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কামারখাড়া

কাওরাদি ব্রহ্মমন্দির
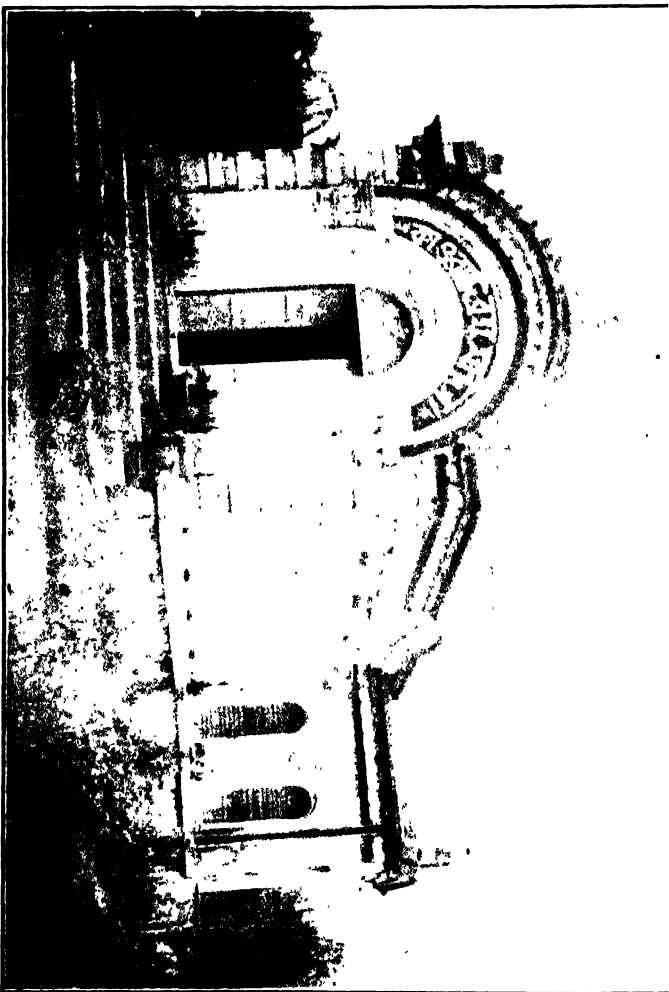
প্রভৃতি স্থানে সদলে ধর্ম্মপ্রচার করেন। কীর্ত্তন, উপাসনায় নানা স্থানের লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুন্সীগঞ্জে, জগৎ বাবু ও চণ্ডীবাবুর গৃহে উপাসনা কীর্ত্তন এবং বারুণীঘাটের মেলায় কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। মেলাস্থলে দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহার বিশেষ অনুরোধে কামারখাড়া গমন করেন। তথায় জমাট ভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। "দেহের কি দেখিতে পার বাহিরে" এই গানে দ্বারিকবাবু মুগ্ধ হন। ঐ গানের একটি পদ এইরূপ—

"পাঁচ ভূতে গড়া দেহের পিঞ্জিরা,
তাতে কালী-পাখী বাস করে রে ;
(সে ত) বলে না জাত বুলি,
তাই তারে বলি হ'য়ে কেন তুই মবুলি না রে ?"

গানের এই অংশ শুনিয়া দ্বারিক বাবু গুপ্ত মহাশয়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। যাঁহার গানে এমন মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার অকালমৃত্যু-কামনার কথা শুনিয়াই তিনি বাধা না দিয়া পারেন নাই।

কামারখাড়ার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরিয়া সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া তর্ক করেন। রাত্রির অধিকাংশ সময় তর্কে অতিবাহিত হয়। পরদিন কীর্ত্তনে অতি সহজেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংশয় দূর হয় এবং অশ্রুপাত করিয়া নিরাকারতত্ত্ব স্বীকারে বাধ্য হন। তথায় এমন ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিয়াছিল যে সমস্ত দিন কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তিনি সময় সময় প্রজাদিগকে একত্র করিয়া বলিতেন "ভ্রাতৃগণ, আজ ঈশ্বরের দয়ায় সকলে একত্র হইয়াছি। আমি যে তোমাদিগকে কেবল রাজকরের জন্য ডাকিয়াছি এমন নয়। ভগবানই

সকলকে ডাকিয়াছেন। তিনিই রাজাধিরাজ মহারাজ। আমরা সকলে তাঁর প্রজা। চল ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করি, যাহাতে চরিত্র পবিত্র হয় তাহার চেষ্টা করি। তোমরা কত মেঘ রৌদ্র সহ্য করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ও শস্য উৎপাদন করিতেছ! একবার ভাবিয়া দেখ এ সমস্ত কে যোগাইতেছেন। তিনি ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই এ সকল দেয়। বীজবপন এবং শস্যকর্ত্তনের সময় তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিও। তবেই জীবনধারণ সার্থক হইবে।"

তাঁহার শেষ জীবনে উৎসবের সময় কখন কখন একটি বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতেন। চাঁদোয়া টানাইয়া দিতে চাহিলে বলিতেন, "এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা চাঁদোয়ার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া আছে। ঈশ্বরদত্ত চাঁদোয়ার মত সুন্দর চাঁদোয়া কোথায় পাওয়া যাইবে?"

একবার মফস্বলে কয়েকদিন বাস করিয়া আহারান্তে নৌকায় উঠিয়া কাছারীতে ফিরিতেছিলেন। পথে বলিলেন "দাতা ব্রহ্ম কখনও দুধ ঘি ছাড়া খাওয়ান নাই। আজ ঐসকলের অভাবে বড় তৃপ্তির সহিত আহার হইয়াছে।" পরে নৌকা কতক পথ অতিক্রম করিলে, একটি প্রজা দুধের নানা প্রকার খাদ্য তাঁহার জন্য নৌকায় আনিয়া উপস্থিত করিল। দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি ঘন ঘন কেবল ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অন্য কিছু বলিতে পারিলেন না।

কোন গ্রামে তাঁহার আগমন হইলে সে বার্ত্তা লোকের মুখে মুখে চারিদিকে প্রচারিত হইত, এবং দলে দলে লোক একত্র হইয়া তাঁহার মধুর উপদেশ শুনিত। বক্তৃতার জন্য কোন বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।

তবু শ্রোতার অভাব হইত না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই লোকে তাঁহার কথা শুনিত। বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি কখনও ভাবে উচ্ছ্বসিত, কখনও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যাইতেন।

কাওরাদি কাছারীতে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইত; তিনি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিতেন। একটী বৈরাগী সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিত এবং গান করিয়া শুনাইত। একদিন এই বৈরাগীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত সুরে

"মন রে, তুই মনের মত হ'লি না বৈরাগী"

গীত রচনা ও গান করিয়া শুনাইলেন। তাঁহার রচিত গান শুনিয়া বৈরাগীর ক্ষণকালের জন্যও আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই।

তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরলা দাস যাহা বলিয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিতেছি;—"ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার কিরূপে জীবনময় হয় তাঁহার জীবনে তাহা দেখিয়াছি। তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায় বাস করিতেন ধর্ম্মের অনুশাসন করিতেন। একবার আমাদের সকলকে লইয়া নৌকায় ভাটপাড়া যাইতেছিলেন। পথে কালীগঞ্জের বাজারে কয়েক খানি বই হাতে নামিলেন। বাজারে ২।৩ ঘণ্টা কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলেন। যখন ফিরিলেন তখনও কয়েক জন নৌকা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, এবং বলিতেছিল "রায় মহাশয়, যে মধুমাখা কথা শুনাইলেন এমন কথা আবার কবে শুনিতে পাইব?" ব্রহ্মনাম এমন মধুর করিয়া বলিতেন যে, শ্রোতাদের হৃদয় অবশ্যই আকৃষ্ট হইত।

"বোধ হয় ১৮৯৭ সনে আমাদের অনুরোধে শিলচর গিয়াছিলেন। তথায় যে কয়েকদিন ছিলেন বাসায় বাসায় কীর্ত্তন ও আলোচনা হইয়াছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার বাসায় ফিরিতে রাত্রি ১১টা

হইত—আমি ভাত লইয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন বলিলেন, "কাল নগর সংকীর্ত্তন হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঊষাকীর্ত্তন করিতে চাই।" তিনি বৃদ্ধ, আর শিলচরে দারুণ শীত। তাই বলিলাম, "এত শীতে কি করিয়া ঊষা কীর্ত্তন করিবেন?" বলিলেন "তাঁর নাম করিয়া বাহির হইব, শীতে কি করিবে?" পরে নিজে খোল লইয়া ঊষা কীর্ত্তন করিয়া আসিলেন।

"অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তনে প্রথমে দুইটি খোল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ অনুরাগ ও ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া এত লোক জমিল যে, বারটি খোলের গভীর শব্দে ও জনমণ্ডলীর প্রমত্ত কীর্ত্তনে সমস্ত সহর কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ দিন ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং নয়নজলে তিনি অনেককে কাঁদাইয়াছিলেন; কেহ কেহ বলিয়াছিলেন 'আমরা এমন ব্রাহ্ম আর দেখি নাই। ইঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল।'

"এই সময় 'ভজ ব্রহ্মানন্দ প্রেম, কর মর্ত্ত্য স্বরগধাম' এবং 'এক ব্রহ্ম জগতের মূলাধার' এই দুইটি গান তাঁহার মুখে শুনি। শেষোক্ত গানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ, মত ও সাধনতত্ত্ব সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য গীতটি উদ্ধৃত করিতেছি;

একব্রহ্ম জগতের মূলাধার,
তাই ব্রহ্মনামটি কর সার;
(তিনি) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা রে,
দয়া প্রেমের অবতার।
শুক সনাতন নারদ ঋষিগণ,
(এই) ব্রহ্মনামে ব্রহ্ম-ঋষি জানে জগত জন;
(সদা) হৃদয়ে বিরাজেন ব্রহ্ম,
আত্মারূপে সবাকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর,
কথায় বলে তাঁরাও সদা ভাবেন ঈশ্বর ;
(তবে), এক কাণায় আর কাণায় ধ'রে রে,
কেমন ক'রে করবে পার ?
(ফলে) দৃষ্ট বস্তু যত চরাচর,
জীব কি জড় তরুলতা, কেহ নয় ঈশ্বর ;
(তবে) এই দেবের সাধনায় কেমনে হ'বে উদ্ধার ?
ব্রহ্ম যদিও হয় রে নিরাকার,
তবু সত্যরূপে ঘরে ঘরে করিছেন বিহার ;
তিনি জীবের জীবন, পতিতপাবন,
মনোহর পরম সাকার।
ব্রাহ্মধর্ম্মে নাইক জাতবিচার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, সন্দেহ কি তার ?
তাইত চণ্ডালে হয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ,
ব্রহ্মরাজ্যে এই স্বীকার।
বলি, দ্বিধা ছেড়ে সিধাপথে যাও,
একমতি একগতি হ'য়ে একের দিকে চাও ;
যেমন সতী নারীর একই পতি রে,
এক বিনা জানে না আর।
আছে সকলেরই সমান অধিকার,
দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, পাপী দুরাচার ;
ডাকলে হৃদয় খুলে' ব্রহ্ম ব'লে রে,
অনায়াসে পাবে নিস্তার।"

"আমার কন্যার বিবাহে অন্ত একবার শিলচর গিয়াছিলেন। তথাকার

লোকেরা মনে করিত মেয়েদের গান করা নিন্দনীয় ব্যাপার। বাবা লোকের এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য মেয়েদের উপরই বিবাহের গানের ভার দিয়াছিলেন।

"তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া তথাকার লোক পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। একটি বিধবা নারী একাদশী বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'তুমি চিরকাল একাদশী করিয়া আসিতেছ, তোমাকে আর আমি কি বলিব? তবে একাদশীর প্রকৃত অর্থ হরিবাসর, অর্থাৎ হরিনাম করিয়া জীবন যাপন করা, মত্ত হওয়া; যদি এরূপ করিতে পার তবেই একাদশী করা সার্থক।'

"তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। বউদেরে, মেয়েদেরে মা বলিয়া ডাকিতেন। কোন ব্যাপারে কখনও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখি নাই। সকল অবস্থায় শান্তভাব রক্ষা করিতেন। একবার একখানি অতি প্রয়োজনীয় পত্র হারাইয়া যায়। কিন্তু একটুও অস্থির না হইয়া কেবল ওঁব্রহ্ম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকল ব্যাপারে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিলে উত্তর করিতেন, 'এই নামেই সকল মুস্কিল দূর হইবে।' ফলতঃ ব্রহ্মনামকে মূলমন্ত্র ও পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া ধরিয়াছিলেন।

"আমাদের কত সুন্দর কথাই বলিয়াছেন তাহা আর কি বলিব? বলিতেন—'মা, উপাসনা কখনও ভুলিও না, পরিত্যাগ করিও না। ইহাই জীবনকে মধুময় করিবে। আমাকে তুমি এবং তোমাকে আমি ভালবাসিব ইহা আর আশ্চার্য্য কি? কিন্তু প্রতিবেশীকে যদি আপনার মত ভালবাসিতে পার তবেই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। উপাসনার ভিতর দিয়াই ইহার প্রকৃত সাধন।'

"কাওরাদির মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় মা উপাসনা করিয়াছিলেন। মার রচিত "আজি এই মহোৎসবে ডাকিয়ে এনেছেন সবে" এবং "তোমারি ইচ্ছা প্রভু হইতেছে পূরণ" এই দুইটি গীত গান করা হইয়াছিল। মার এমন শক্তি ছিল যে, উপাসনার স্থলে বসিয়াই গান রচনা করিতে পারিতেন। অসুস্থ শরীর লইয়াও মা উৎসবে সুন্দর উপাসনা করিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে মার নিত্য সম্পর্ক, এজন্য বাবার কথার সঙ্গে মার কথাও আসে।

"মাতৃবিয়োগ হইলে আমি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। চক্ষুর জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইত। একদিন স্বপ্নে মা বলিলেন 'তুমি এত কাঁদ কেন? ডাল পালা ধরিলেত এইরূপই হইবে। ডাল পালা কিছুই স্থায়ী নয়। অতএব ডাল পালা ছাড়িয়া গাছ ধর। তবে আর অধীর হইতে হইবে না। যতদিন দেহে ছিলাম এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, এখন তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি। শান্তিময়ের কাছে আসিয়া বড় শান্তিতে আছি। তোমরা অধীর হইলে সে শান্তিতে বাধা জন্মে; শান্তির জন্য তাঁকে ধর, কান্না-কাটি ছাড়।'

"স্বপ্নে মার কথা শুনিয়া আমার শোক প্রশমিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যে ডাল ধরি না কেন তাহা যে ভাঙ্গিবেই, স্থির হইয়া তাহাতে বসিতে পারিব না তাহা বুঝিয়াছিলাম। ইহাতে অনন্ত জীবনের আশ্রয়ের প্রতি দৃষ্টি গিয়াছিল।

"মাতৃশোকাচ্ছন্ন সন্তানগণকে বাবা বলিতেন 'এত কাঁদ কেন? দালানে যত জোরে কোবার ঘা পড়ে দালান তত শক্ত হয়। সংসারের দুঃখ, শোক, বেদনা যত প্রবল হয়, তাঁর জন্য তত ভাল করিয়া প্রস্তুত হওয়া যায়। শোক তাঁর দয়ার দান। এই সব

আঘাত দিয়া তিনি মোহবন্ধন ছিন্ন করেন। দাতাকে এজন্য ধন্যবাদ দাও। কাঁদিয়া অধীর হইও না।'

"বিমলা স্বামীর আসন্নমৃত্যুকালে শোকে অধীর হইলে, বাবা স্বপ্নে তাহাকে বলিয়াছিলেন 'মা, মৃত্যুকে অমৃতের সোপান জান।' এই বলিয়া তিনি কন্যার সমস্ত শরীরে স্নেহহস্ত বুলাইয়া শোক প্রশমিত করেন। বিমলা ইহাতে দারুণ শোকের মধ্যেও সান্ত্বনা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাবা এইরূপে আমাদের সহায় হইয়া আছেন।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় বলিয়াছেন—"নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। এ কার্য্যে আমার কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়া প্রায়ই আমাকে তাঁর সঙ্গে প্রচারে আহ্বান করিতেন। একবার নৌকায় টোকচাঁদপুর যাই। মধ্যাহ্নের আহারের পর কাওরাদির ব্রাহ্মগণসহ আমাদিগকে লইয়া যাত্রা করিলেন। নৌকায় ভাবসঙ্গীত ও গভীর ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইল। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলাম তথাকার লোকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। লোকদের আগ্রহের অবধি ছিল না। আমাদিগকে পাইয়া তাহারা মহানন্দে ঘিরিয়া বসিল। পূর্ব্বে সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। গুপ্ত মহাশয় সমবেত লোকদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। পরে উপাসনাদি হইয়া আমাদের আহার হইল। আহারাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইলেও সমবেত লোকমণ্ডলীর এবং গুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ অনুরাগে পুনরায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শীতের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিল। পরে আমরা শয্যার আশ্রয়

লইতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরও অনেক-ক্ষণ চলিল।

"এইরূপে কয়েক দিন মগ্নভাবে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, কীর্ত্তন ও একদিন শিষ্যাদলসহ আমাদের প্রমত্ত নগরকীর্ত্তন হইল। 'নামে প্রেম উথলে যখন মনে, বুড় নাচে ছেলের সনে, তখন সমানভাবে গুণে আনে, এক পয়সা আর লাখ রে' গানের এই ভাব সেদিন বিশেষ ভাবে অনুভব করিলাম। বৃদ্ধ পিতা ব্রহ্মনামে মাতিয়া যুবক পুত্র শ্রীমান বিনয়ের সঙ্গে নৃত্য করিলেন।

"গ্রামের যে সমস্ত লোক তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য একত্র হইত, তাহাদের অনেকেই অশিক্ষিত; অনেকেরই নগ্নপদ ও কাপড় হাঁটুর উপরে। কিন্তু তিনি এই প্রকার লোকদিগকেও মহা সমাদরে নিকটে বসাইয়া ধর্ম্মকথা বলিতেন। সাধারণ লোক বলিয়া কাহারও প্রতি সমাদরের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তিনি একজন সম্মানিত ও পদস্থ জমিদার, তবু তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে কাহারও সঙ্কোচ বোধ ছিল না। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তিনি আপামর সাধারণ সকলকে আপনার করিয়া লইতেন।

"তাঁহার আহ্বানে অনেকবার কাওরাদির উৎসবে গিয়াছি। একবার উৎসবের শেষদিন উপাসনায় এক এক জন এক এক স্বরূপের আরাধনা করিবেন এই ব্যবস্থা হইল। আমাকে সত্যস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপের আরাধনা করিতে বলিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় চিন্তিত হইয়াছিলাম। কারণ, বিভিন্ন লোকের দ্বারা উপাসনা কিরূপ হইবে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সকলের আগ্রহ অনুরাগে অতি সরসভাবে উপাসনা হইল। একটি ভৃত্যকে প্রাণস্পর্শী আরাধনা

করিতে শুনিয়া বুঝিলাম তাঁহার সংসর্গে আসিয়া সাধারণ লোকেরাও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে।

"১৩০৮ সনের ২০শে বৈশাখ ভাটপাড়া গ্রামে মাতৃস্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আমার উপর উপাসনার ভার ছিল। উপাসনার পর তিনি মাতৃজীবনী পাঠ করিলেন। ভক্তিতে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত নিমন্ত্রিত মণ্ডলী শ্রাদ্ধোৎসব ভোগ করিলেন।

"এই সময় তিনি যে কয়েক দিন ভাটপাড়া ছিলেন, প্রতিদিন সায়ংকালে গৃহপ্রাঙ্গণে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক তাঁহার নিকট আসিত। শিক্ষিত লোকেরা যাহাদিগকে নিম্ন-শ্রেণীজ্ঞানে তুচ্ছ করে, তাঁহার নিকট তাহাদেরই কত সমাদর দেখিতাম! ইহারা তাঁহারই প্রাণব্রহ্মের সন্তান, সুতরাং কিরূপে ইহাদিগকে অনাদর করিবেন? তাহাদেরও তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। 'কর্ত্তার' দর্শন পাইলে তাহারা সকল ভুলিয়া তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিত।

"একদিন ভাটপাড়ার ৩।৪ মাইল দূরের কোন গ্রামে গিয়া সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। গুপ্ত মহাশয় বৃদ্ধ, চলিতে অসমর্থ, এজন্য তিনি যাইতে পারেন নাই। ফিরিয়া আসিলে তন্ন তন্ন করিয়া সব শুনিতে চাহিলেন। বলিলাম, 'তথাকার একটি লোক শীঘ্রই আপনার নিকট আসিবে,তাহার নিকট সব শুনিবেন।" তিনি বলিলেন "আমার নিকট আসিতে বলিয়াছেন কেন? আমিই তাঁহার নিকট গিয়া সব শুনিতাম।' আমি বলিলাম 'আপনি বৃদ্ধ এত দূর কি যাইতে পারেন?' উত্তর করিলেন 'আমি পাল্‌কি করিয়া যাইতাম।' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কথা শুনিবার জন্য এত আগ্রহ যে পাল্‌কি করিয়া

যাইতে ইচ্ছুক। ইহাতে তাঁহার প্রচারোৎসাহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মনামে গভীর অনুরাগ না থাকিলে এমন প্রচারোৎসাহ জন্মে না। সে অনুরাগের পরিচয় তাঁহার রচিত ভাবসঙ্গীতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

'নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে,
মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে।'

"কাওরাদি হইতে আসিবার সময় তাঁহার পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া বিদায় লইতাম। বিদায়কালে করযোড়ে দাঁড়াইতেন এবং গম্ভীরভাবে ভক্তির সহিত

'নমস্তে সতে তে জগতকারণায়'

স্তোত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ আবৃত্তি করিতেন। অন্য লোক থাকিলে সকলের সমবেত স্তোত্র পাঠ হইত। সমবেত কণ্ঠে যখন বলিতাম 'তুমি সৎস্বরূপ জগতের কারণ, জ্ঞানস্বরূপ সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার' তখন এক স্বর্গীয়ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইত। পৃথিবী ছাড়িয়া ব্রহ্মলোকে আসিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে মিলিয়া ব্রহ্মের স্তব করিতেছি, ইহাই মনে হইত।

"একদিন ট্রেন ছাড়িবার সময় হওয়ায় ব্যস্ততাবশতঃ বিদায়কালের স্তোত্রপাঠের কথা ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া রওয়ানা হইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদূর আসিলে তিনি লোক দিয়া ডাকিলেন এবং ফিরিয়া যাওয়া মাত্র হাতযোড় করিয়া স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। লজ্জায় আমার মস্তক নত হইল। তিনি শান্তভাবে স্তোত্র পাঠ করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

"তাঁহার মধ্যে কখনো উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা দেখি নাই। যেন চিরসরস, চিরআশাপূর্ণ, চিরআনন্দেমগ্ন ছিলেন। ভাবসঙ্গীতের

রচয়িতার জীবনে অভাব নিরানন্দের স্থান ছিল না। তিনি যদিও নিজে তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন, তথাপি কিন্তু তাঁহাকে বিষয়ের কোলাহল স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"একদিন তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন, মনোযোগের সহিত কাহারও সঙ্গে সেই সকল বিষয়ের কথা বলিতেছিলেন ও কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহার কাজের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া আমরা দুইটী বন্ধু তাঁহাহইতে দূরে গৃহের এককোণে বসিয়া আস্তে আস্তে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আভাস মাত্র পাইয়াই আমাদের সঙ্গে আসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে একত্র হইলেন, বিষয়ের কথা সব পড়িয়া রহিল।

"গৃহকার্য্যে ব্যস্ত জননীর কর্ণে অপর কোন শব্দ প্রবেশ না করিলেও শায়িত শিশুসন্তানের অনুচ্চ শব্দটিও অতি সহজে প্রবেশ করে। সমগ্র হৃদয়ের উপরে যাহার প্রভাব তাহার প্রতি মানুষ এমনই উৎকর্ণ থাকে। গুপ্ত মহাশয়ের উপর কোন্ বিষয়ের আকর্ষণ প্রবল ছিল? বিষয়ের নয়; কারণ, তাহা হইলে বিষয়ের চিন্তাতেই ডুবিয়া থাকিতেন। যশের মর্য্যাদার নয়, কেননা তাহাহইলে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি এমন সম্মান দেখাইতে পারিতেন না। তবে সে বস্তু কি, যাহার জন্য তিনি আর সকলই তুচ্ছ করিতে পারিতেন? তাহা ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"তিনি কিরূপ বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল ছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি। পুত্র বিনয়বাবুর বিবাহের পর তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ সমবেত হইয়াছেন। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, মেঘগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত। সকলেরই মনে চিন্তা। সকলকে চিন্তাকুল দেখিয়া তিনি বলিলেন 'কোন চিন্তা নাই, কিছুই হইবে

না।' প্রশ্ন 'এত মেঘ কোথায় যাইবে? এখনই যে বর্ষণ হইবে।' বলিলেন 'তাঁর ইচ্ছা হইলে ঐ এককোণে বর্ষণ হইবে, এখানে কিছুই হইবে না।' ফলে তাহাই হইল, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, বৃষ্টি হইল না।

"তাঁহার দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে শিলচরে শাস্ত্রী মহাশয় আহূত হন। গৃহপ্রাঙ্গণে চাঁদোয়ার নীচে সমবেত মণ্ডলীকে লইয়া ধর্ম্ম-প্রসঙ্গাদি হইত। একদিন কথাবার্ত্তার পর গুপ্ত মহাশয় ভাবসঙ্গীত শুনাইলেন। গান করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল এক দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হইল, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইলেন। একদিন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিজের রচিত একটি গান করিতে আমাকে অনুমতি করিলেন। আমি ঐ গীতটি গান করিলে সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের মুখের ভাব অন্যরূপ ছিল। ঐ গীতের 'থাক থাক লুকাও কোথা, ক'রে আমায় দিশেহারা' পদ তাঁর মনোমত না হওয়ায় তিনি বলিলেন 'পরমেশ্বর কি লুকান?'

"তিনি দরিদ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। জনসমাজে অর্থশালী লোকের অভাব নাই, কিন্তু বিপন্নের সেবায়, দরিদ্রের উন্নতিকল্পে, প্রসন্নমনে অর্থের প্রয়োগ করেন এমন লোকের অভাব আছে। তিনি এই প্রকার একজন সদ্ব্যয়ী লোক ছিলেন। কেননা যখনই কাহারও জন্য সাহায্য চাহিতাম পাইতাম।

"তিনি ব্রহ্মনামের সাধক ছিলেন। হরি কি অন্য কোন নাম লইতেন না। বলিতেন 'অন্য নামে জোর পাই না, ব্রহ্মনামে প্রাণ সতেজ হইয়া উঠে।' ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তনাদিতে ব্রহ্মনাম না শুনিলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার রচিত গানে নাম মাহাত্ম্য যে ভাল করিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত

আছেন। 'ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই, নামের বালাই নিয়ে মরে যাই।' নামের মহিমা কিরূপ জোরে প্রচার করিয়াছেন তাহা নীচের কয়েক পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় ;—

'ভক্ত ব্রহ্মানন্দ প্রেম, কর মর্ত্ত্য স্বরগ ধাম,
ব্রহ্মনাম-কামধেনু দোহি' পিয় অবিরাম।
মৃত দেহে হউক জীবন, মুঞ্জরিত হউক শুষ্কবন,
জীবদেহে দেখি জীবিত জীবন, পুরুক মনের কাম।
ইহ পরলোক হউক এক, পাহাড়ে সাগর লাগুক ঠেক
করিসনে লড়ি ক্ষীণপ্রাণ ভেক জিমুক সংগ্রাম।
এক ভক্ত, সাজ একেরি সমরে, কি ভয় কি ভয়
সুরাসুর নরে ? ব্রহ্ম-অস্ত্র হৃদ্‌ধনুকেতে
যুড়ে, দেখাও বিক্রম।"

"ব্রহ্মনাম-কামধেনুর সুধা পান করিয়া যে এই ভক্ত প্রাণ জীবিত জীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা এমন প্রাণস্পর্শী বাণী হয় না। যে নামে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হয়, শুষ্ক মানুষ সরস তত্ত্বকথা প্রকাশ করে, ভক্ত কালীনারায়ণ সেই নামের মহিমা সিংহবিক্রমেই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই সঙ্গীতে প্রাচীন ঋষির সেই

'প্রণব ধনুঃ শর হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে'

বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হৃদ্ ধনুতে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানী ভিন্ন যুড়িতে পারে না।

"ব্রহ্মনামে ব্রাহ্মগণের জীবনে সময় সময় কি প্রকার বিক্রম প্রকাশ পাইয়াছে, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। সামাজিক উৎপীড়ন, শারীরিক অত্যাচার, পিতা মাতা আত্মীয়গণের অশ্রু কত সময়

তাঁহাদের সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধারূপে উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু ব্রহ্মনামে ক্ষীণপ্রাণ ভেকের সংগ্রামে করীর পরাজয়ের ন্যায় সমস্ত দূর হইয়াছে, তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন।

"ভক্ত কালীনারায়ণ জাগ্রত জীবন্ত ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। মৃতপ্রাণ লইয়া, অসার দেহ লইয়া কখনও ব্রহ্মের পূজা হয় না। এ নিমিত্ত সকলকে জাগাইয়া দিতে, সকলের মধ্যে একটি সজীবতার সঞ্চার করিতে তাঁহার সর্ব্বদা প্রয়াস ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মসাধকের এমন প্রয়াস কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক ও সেবা।

প্রজাদের প্রতি তাঁহার সন্তানতুল্য স্নেহ ছিল। তাহাদের পার্থিব এবং ধর্ম্মবিষয়ের উন্নতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজাদের মধ্যে যাহাদিগকে নিঃসহায় বিপন্ন দেখিতেন সময় সময় তাহাদিগকে দুই তিন বৎসরের খাজনা হইতে অব্যাহতি দিতেন। অনেক সময় প্রজারা তাঁহাকে সালিস মান্য করিত, তিনি তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। মিথ্যাসাক্ষীর সাহায্যে কেহ তাঁহাকে ছলনা করিতে পারিত না। কারণ, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তিনি সহজেই লোকের মনের কথা বাহির করিয়া লইতেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছলনা করিত তিনি তাহাদিগকেও প্রেমে বশ করিতেন। একবার একটি প্রজা দুষ্টামি করিয়া তিন চারি বৎসরের খাজনা অনাদায় রাখে।

কাছারীর নায়েব অবশেষে তাহার দমনের নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ ব্যক্তি আদালত কর্ত্তৃক মোকদ্দমার ব্যয়সহ খাজনা দিতে আদিষ্ট হইলে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। তখন সে নিরুপায় হইয়া গুপ্ত মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে। তিনি তাহার মোকদ্দমার ব্যয় মাপ করেন ও সে ব্যক্তি বাধ্য হয়।

প্রজাদের মুখে এমন কথা শুনা গিয়াছে যে "রোগের সময় কর্ত্তা আসিয়া কাছে বসিলে প্রাণ জুড়াইত।" এজন্য কত সময় রুগ্ন, আসন্নমৃত্যুর শয্যাপার্শ্বে যাইতে তিনি অনুরুদ্ধ হইতেন ও গিয়া রোগীকে সাহস ও পরামর্শ দিতেন।

তাঁহার প্রতি তাহাদের এমন ভক্তি ও ভালবাসা ছিল যে, বাড়ীর নূতন গাছের ফল তাঁহাকে না দিয়া খাইত না। এমন কি গাছে ফল না হইলে তাঁহার নামে মানস করিত, এবং প্রথম ফল তাঁহার সেবার নিমিত্ত আনিয়া উপস্থিত করিত। ইহাতে অনেক সময় তাঁহার গৃহে রাশি রাশি ফল সঞ্চিত হইত।

একবার একটি প্রজা গাছের প্রথম ফল তাঁহাকে দিবার জন্য নৌকার অভাবে নদী সাঁতরাইয়া কাছারীতে আসিয়াছিল।

একবার পরিবারের সকলকে লইয়া পটুয়াখালী গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রবল বন্যায় সে বৎসর বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। যদিও পথে তাঁহাদের কোন বিপদ হয় নাই, তবু কিরূপে যেন কাওরাদির লোকের মধ্যে "রায় মহাশয়ের নৌকা মারা গিয়াছে" এই সংবাদ প্রচারিত হয়। ইহাতে তাঁহার অনুগত লোকসমূহ এমন অধীর হয় যে, ঘটনার নিশ্চয়তা জানিবার জন্য তিনটি লোক দুই দিনের পথ হাঁটিয়া ঢাকায় উপস্থিত হয়। এবং গুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব্বের বাসায় লোক জনের সহিত

সাক্ষাৎ না হওয়ায়, নিশ্চিৎ মৃত্যু কল্পনা করিয়া, প্রকাশ্য পথে বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে। রাস্তার লোকে তাহাদের ক্রন্দনের কারণ জানিয়া "রায় মহাশয়ের অভাব হয় নাই, তিনি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন" বলিয়া তাহাদিগকে শান্ত করে এবং বাসা দেখাইয়া দেয়। পরে তাহারা রায়মহাশয়ের (কালীনারায়ণ) দেখা পাইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। তিনি সব অবস্থা শুনিয়া তাহাদের শান্ত করেন *

ইহার পর তিনি কাওরাদি উপস্থিত হইলে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য একত্র হইয়াছিল এবং স্ত্রী লোকেরা উলুধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। তৎপর যখন বিদায় লইয়া ঢাকা রওয়ানা হন লোকমণ্ডলী সমবেত হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল।

তাঁহার কন্যা পরলোকগত বিমলা দাস লিখিয়াছেন ;—"তিনি তাঁর প্রজাবর্গকে ফেলিয়া স্থানান্তরে এমন কি সন্তান সন্ততিদের কাছে যাইয়াও বেশীদিন থাকিতে পারিতেন না। অনেক সময় আমরা অভিমান করিয়া বলিয়াছি 'বাবা, আমাদের কাছে আসিয়াও আপনি দুদিন সুস্থির থাকিতে পারেন না? কেবল কাওরাদি কাওরাদি করিয়া পাগল হন?' তিনি গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেন 'মা তোমরা এমন অবুঝের মত কথা কও কেন? ভগবানের ইচ্ছায় তোমরাত সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, মা। তোমরা ভুলিয়া যাও যে, তোমরা যেমন আমার সন্তান তেমন আমার আরো কত সন্তান সেখানে দুঃখে দিন কাটায়। আমি দূরে গেলে তারা কার মুখের দিকে চায়? কে তাদের দুঃখ নিবারণ করে বল? তাদের সমস্ত সুখ দুঃখের বোঝা আমায় দিয়া তারা যদি নিশ্চিন্ত না হইতে পারিল,

* শ্রীযুক্ত সরল দাস মহাশয়ার কথিত।

তবে আমি তাদের কিসের প্রভুগিরি করি? তাই সে সকল সন্তান ফেলিয়া আমি বেশীদিন দূরে থাকিতে পারি না।"

কাওরাদির ব্রাহ্মগণের তিনি আত্মীয়, বন্ধু ও আশ্রয় ছিলেন। খাদ্য, বস্ত্র, ও ঔষধ, পথ্য কি অর্থ যখন যাহা প্রয়োজন তদ্দ্বারা তাহাদের তিনি সাহায্য করিতেন। তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের তিনি পিতৃস্থানীয় ছিলেন। একদিন তথাকার ব্রাহ্মদিগকে বলিলেন "বাপের বাড়ী গিয়া কয়েকদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে স্বভাবতঃ মেয়েদের ইচ্ছা হয়। বাপের বাড়ী গিয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু তোমরা সমাজচ্যুত হওয়া অবধি তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আদর যত্ন করিবার তাহাদের কেহ নাই। আমি তোমাদের বাড়ীর মেয়েদেরে আমার বাড়ীতে আনিয়া এই অভাব পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাহারা কয়েকদিন আমার গৃহে পিতৃগৃহের সুখ ভোগ করিবে।" এই বলিয়া তাহাদের মেয়েদের সকলকে নিজের কাছারী বাড়ী আনাইলেন এবং চারি পাঁচদিন রাখিয়া অত্যন্ত আদর যত্নে খাওয়াইলেন। পরে প্রত্যেককে নূতন বস্ত্রাদি দিয়া স্বামীর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলে এই সকল ব্রাহ্মমেয়ে ও বউদের জন্য নানা দ্রব্য আনিতেন। কোন নূতন গীত রচনা করিলে ইহাদিগকে না শুনাইয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

তাঁহার সংসর্গে আসিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। নিত্যানন্দ আচার্য্য তাঁহার এইরূপ একজন সঙ্গী। নিত্যানন্দ লিখিয়াছেন ;—

"একদিন তাঁহার সহিত নির্জ্জন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

আমাকে একাকী পাইয়া বলিলেন 'তুমি বিবাহ কর, বিবাহ না করিলে তোমার কষ্টের লাঘব হইবে না।' আমি অন্ধ, দরিদ্র, নিজেরই উদরান্নের সংস্থান নাই, এ অবস্থায় বিবাহের কল্পনা মনে আনাও অনুচিত বোধ হইল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার। তাই অন্ধের জীবনের ভার লাঘব করিতে ব্যস্ত হইলেন। অন্ধের হস্তে যষ্টি তুলিয়া না দিলে তাহার পথ চলিবার উপায় হইবে না, এই মনে করিয়া বার বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল তাই নয়, বলিলেন 'আমি বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করিব'। লজ্জায় সঙ্কোচে আমার মুখে কথা নাই, কিন্তু তবু তিনি উত্তর না পাইয়া ছাড়িলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম 'আমি অন্ধ, আমার কি বিবাহ করা উচিত? বিশেষতঃ আমার নিকট কেই বা কন্যা দিবে?'

"বলিলেন 'চেষ্টা কর, চেষ্টা করিলে অবশ্যই হইবে।' পরে তাঁহার আদেশে চেষ্টা হইল, বিবাহ স্থির করিলাম, বিবাহের ব্যয় বাবদ তিনি একশত টাকা এবং বিবাহে হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দিলেন। পরে জীবিকার জন্য জমি, সন্তান হইলে তাহার নামকরণের ব্যয় ৫০৲ টাকা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, ভবিষ্যতের জন্য এককালীন চারিশত টাকা দিলেন। বিশবৎসর ধরিয়া এইরূপ আরও কত যে সহায়তা তাঁহার নিকট পাইয়াছি, সে সকলের বলিয়া শেষ হয় না।

তাঁহার ব্যবস্থায় সন্তানাদি লাভ করিয়াছি। ইহপরকালের সম্বল ধর্ম্মবিশ্বাস পাইয়াছি। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র, তিনি গুণী, আমরা নির্গুণ, তিনি তত্ত্বজ্ঞ, আমরা অজ্ঞান, কিন্তু তবু আমাদের মত লোককে সমাদর করিয়াছেন, সঙ্গী করিয়াছেন, বন্ধুর ন্যায়

ব্যবহার করিয়াছেন। যদি শতকণ্ঠে তাঁহার গুণের কথা, দয়া ও প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি তবু শেষ হয় না। অজ্ঞান, দরিদ্র, ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিয়া কিরূপে শান্তির জীবন যাপন করে, আশ্রয়হীন কি রূপে গৃহে পারিবারিক জীবন যাপন করে, আমাদের দ্বারা তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সংসর্গে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা ভুলিবার নয়।

"পুত্রশোকের দারুণ আঘাত কিরূপে সহ্য করিতে হয়, তাহাও তাঁহাকে দেখিয়া শিখিয়াছি। যোগ্য পুত্রের শোকে মুহ্যমান না হইয়া তিনি যে কথাটী বলিয়াছিলেন উহা অদ্যাপি মনে পড়ে। উহা পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিয়াছে। বলিয়াছিলেন 'ভগবান তাঁহার গচ্ছিত ধন লইয়াছেন, ইহাতে দুঃখ করিলে চলিবে কেন?' এমন সজ্জন বন্ধুকে হারাইয়া আমরা অনাথ হইয়াছি।"

কাওরাদির দরিদ্র কৃষকগণের ভবিষ্যৎ সংস্থান উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন হইতে তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু পূর্ণ হয় নাই। অবশেষে ১৩০৯ সনে একটি পত্তনি গড় পত্তনে এককালীন অনেকগুলি টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় সে সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি ব্রাহ্মগণের নামের একটী তালিকা করিয়া সকলকেই কিছু কিছু দান করিলেন। উহাতে নিম্নলিখিতরূপ দান করেন—শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্য ৫০০, অধর সাহা ৫০০, নিতাই আচার্য্য ৩৫০, বোচাই ২০০, শরৎ ২০০, গগন ১০০, গণেশ ৭৫, হৃদয়ের পত্নী ৫০, অধরের পত্নী ৫০, নিতাইর কন্যা ৫০, সাচু আচার্য্য ৫০, মোট ২১২৫ টাকা।

এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করেন—

"হে উদার দাতা, আমি আশার অনুরূপ কাজ করিতে পারিব এমন ভরসা ছিল না। কিন্তু আজ তুমি আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হইতে

দিলে। আজ আমার দ্বারা এই স্থানের দরিদ্র ব্রাহ্মণদের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিলে। ইহাতে আমার কোন হাত নাই, তুমিই আমার দ্বারা তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিলে। অতএব তোমাকেই এজন্য হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।"

প্রার্থনান্তে সকলকে টাকা দিলেন। পিতা সন্তানগণের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করেন, ইহা কি তাহারই অনুরূপ নয়?

তিনি একবার বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আরা গমন করেন। এই সময় নিতাই আচার্য্যের পত্নীবিয়োগ হয়। শুনিয়া মাতৃহীন শিশুগণের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন হন। সে উদ্বেগ কেবল কথায় পর্য্যবসিত হয় নাই। অর্থ সাহায্য ও আবশ্যক ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে তিনি হৃদয় আচার্য্য মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাহইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"নিতাইর বিপদে কি ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা বুঝাইতে পারি না। নিতাইকে পত্র লিখিয়াছি ও তাহার শাশুড়ীর হাতে শিশুদিগের প্রতিপালনের ভার দিতে লিখিয়াছি। বর্ত্তমান পৌষমাস হইতে তাহার বালকগণের বিশেষতঃ নূতন বালিকার পোষণ জন্য মাসিক তিন টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীমান কৈলাশের নিকট পত্র লিখিয়াছি। তাহাতে নিতাইর শাশুড়ীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিয়াছি। শিশুটিকে রক্ষা করিতে পারিব এমন আশা করি না, তবে ভগবান রক্ষা করিলে অবশ্য নষ্ট না'ও হইতে পারে। শ্রীমান সাচু আচার্য্য এখন কংশেরকুল গ্রামে থাকিতেছে বলিয়া লেখ ; তথায় কি ভাবে কোথায় আছে তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবা। তাহার মতি গতি কি পরিবর্ত্তনের পথে যাইতেছে? কংশেরকুলে বিনাপরামর্শ বিনা সপক্ষে—পরামর্শ দিবার কেহ নাই—এবং ধর্ম্ম ও মত

রক্ষা করিয়া যে তথায় থাকিতে পারে এমন সুযোগ কি আছে? অতএব নিতান্ত ভয়ে ভয়ে আছি। আমূলতত্ত্ব সত্বর জানাইবা।

কাওরাদি মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনাদির যাহাতে বাধা না পড়ে তাহার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবা। গণেশ পাল ভালরূপ আরাম পাইয়াছে কি না এবং অধর, দয়াল ও তুমি সপরিবারে কেমন আছ তাহা জানাইবা। মদন কোন্ দিকে যায় ও কেমন আছে জানাইবা। সর্ব্বদা সকলকে নিয়া উপাসনা করিবা। অন্যের বিরক্তিতেও তুমি সহিষ্ণু হইয়া যাহাতে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন ও প্রচার হয় তাহা করিবা। আপন দায়িত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবা। তোমাদের সকলের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ হউক, যিনি সকলের প্রাণে ভক্তি বিশ্বাস বিধান করিতেছেন ও করিবেন।" ১২৯৯ সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ।

কেবল প্রজা অথবা অনুগত ব্রাহ্মদের সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন, এমন নয়। বিপন্ন যে কোন ব্যক্তির সাহায্যার্থ অর্থ এবং সময় ব্যয় করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

একবার একটি আসন্নপ্রসবা বৈষ্ণব মেয়ে কাওরাদি আসে, এবং প্রসববেদনায় কাতর হইয়া পড়ে। গুপ্ত মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাহার জন্য ধাত্রী নিয়োগ ও অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা করেন। পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে লোক দিয়ে আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

অন্য সময় একটি ভৃত্যপত্নীরও এই অবস্থা হয়। এই মেয়েটি হঠাৎ কলেরায় স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় বড় বিপন্না হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় কন্যার ন্যায় ইহারও সমস্ত ব্যবস্থা করেন, এবং সুস্থ হইলে লোক ও পাথেয় দিয়া দেশে পাঠাইয়া দেন। ইহার বাড়ী অযোধ্যা প্রদেশে।

কেহ মৃত শব লইয়া বিপন্ন হইলে তিনি তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, লোক দিয়া অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন।

তাঁহার কাছারীতে অতিথি-সেবার আয়োজন ছিল। কাওরাদি একটি রেলওয়ে ষ্টেসন। এ জন্য তাঁহার কাছারীতে সর্ব্বদা নানা শ্রেণীর লোক অতিথি হইত। অতিথিদের কাজের জন্য তিনি একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। চাউল ডাইল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কাছারী হইতে দেওয়া হইত, ভৃত্য সমস্ত আয়োজন করিয়া দিত, অতিথি রন্ধন করিয়া আহার করিত। একদা ঐ ভৃত্য একটি ব্রাহ্মণ অতিথির হলুদ চূর্ণ করিয়া দিতে অস্বীকার করায় সে কথা গুপ্তমহাশয়ের গোচর করা হয়। তিনি ভৃত্যকে সাবধান করেন। কিন্তু ভৃত্য নিজের দোষ স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাতে তিনি ভৃত্যকে বলিলেন "অতিথি আমার গুরুতুল্য। আমি সমর্থ না হওয়ায় এ কার্য্যের ভার তোমাকে দিয়াছি। এ কাজ তোমাকে অগ্রেই করিতে হইবে।" অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা না করায় এই বিশ্বাসী ভৃত্যকে তিনি অবশেষে বিদায় দিতে বাধ্য হন।

অতিথির জন্য সময় সময় তাঁহার গৃহেও লোকবাহুল্য ও তজ্জনিত কিঞ্চিৎ অসুবিধা না হইত এরূপ বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে তিনি কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার জীবনযাত্রায় কোন আড়ম্বর ছিল না। সর্ব্বদা শিশুর মত সরলভাবে জীবনযাপন করিতেন। অতিথিগণ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেবা ও সাধুসঙ্গ এক সঙ্গে লাভ করিয়া সুখী হইত।

কোন অতিথি দুই একদিন থাকিয়া প্রস্থান করিলে সঙ্গে পাথেয় ও খাদ্যের সংস্থান আছে কি না সংবাদ লইতেন, এবং যাহা প্রয়োজন

দিতেন। আত্মীয় বন্ধুর জন্য লোকে যতটুকু করে তিনি অতিথির জন্য ততোধিক করিতেন।

তাঁহার কথায় কি ব্যবহারে কাহারও মনে কোনরূপ ক্লেশ হইলে উহা তাঁহাকেও ঘোর অশান্তিতে নিক্ষেপ করিত, তাহা দূর না করিয়া স্থির হইতে পারিতেন না। একদিন নিতাইর অসাবধানতায় তাঁহার একটী মূল্যবান দ্রব্য নষ্ট হয়, তিনি হঠাৎ একটু অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হন। ইহাতে তাঁহারও মনে ঘোর অশান্তি জন্মে। নানা প্রকার মিষ্টব্যবহারে নিত্যানন্দের অসন্তোষ দূর করিয়া তবে সুস্থির হন।

একদিন একটী লোক তাঁহার নিকট লিচু চাহিয়াছিল। কিন্তু গাছে একটিও লিচু ছিল না, সব নিঃশেষ হইয়াছিল। প্রার্থীর মনে ব্যাথা তাঁহার সহিল না, তিনি বলিলেন "ভাইরে লিচু ত নাই। যদি লিচুর বদলে আম লও দিতে পারি।" এই বলিয়া তাহাকে কতকটী আম দিলেন। সে ব্যক্তি সুখী হইয়া চলিয়া গেল।

কাওরাদি কাছারীর নায়েবকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর যতদিন জীবিত ছিলেন কোন প্রজাকে কখনও কটু কথা বলিতে শুনি নাই। প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। প্রজাদিগের প্রতি কখনও কোন আদেশ করিলে তাহারা আনন্দের সহিত উহা পালন করিত। আমি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, কিন্তু আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পূজা পার্ব্বণে পিতা যেমন সন্তানকে পয়সা দেয়, কর্ম্মচারীদিগকে তিনি তেমনি পয়সা দিতেন। আমি একজন সাধারণ লোক, লেখা

পড়া জানি না, অথচ আমার উপর কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শেষ বয়সে যদিও অধিকাংশ সময় কাছারীতে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু জমিদারীর কাজ কর্ম্ম সমস্ত আমার উপর দিয়া ধর্ম্মালোচনায় রত থাকিতেন। জমিদারী কার্য্য লইয়া কেহ বিরক্ত করে ইহা পছন্দ করিতেন না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যেরূপ নেশা দেখিয়াছি, দুঃখী নিরাশ্রয়, বিপন্নের জন্য যেমন ব্যথিত হইতে দেখিয়াছি, এমন আর দেখিব না।"

কোন সময় একব্যক্তি আঠার শত টাকায় তাঁহার নিকট একটি গজারি গড় পত্তন লয়। যথাসময়ে এই টাকা আদায় না হওয়ায় সুদ সমেত চব্বিশশত টাকা প্রাপ্য হয়। এবং আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে নিরুপায় দেখিয়া দয়ার বশ হইয়া সুদের সমস্ত টাকা মাপ করেন।

কেবল মানবসেবাতেই তাঁহার চেষ্টা আবদ্ধ ছিল এমন নয়। ইতর জীবের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত দয়া ছিল। পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেমন লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তেমনি পশু, পক্ষী, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি ইতর জীব জন্তুর আহার হইল কি না তাহাও দেখিতেন। মাছের জন্য জলে খাবার ফেলিয়া দিতেন। একবার নৌকায় যাইতে সঙ্গের নায়েব হাঁড়িতে কতক গুলি কৈ মাছ জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে তিনি উহা এক একটি করিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন, এবং পরদিন অনুসন্ধান হইলে বলিলেন "তোমরা বিরক্ত হইও না, আমি মাছগুলি নদীতে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কাওরাদির নিকটবর্ত্তী নদীতে মাছধরার জন্য তিনি ৭০৲ টাকা খাজনা পাইতেন। জীবহিংসা পাপ বোধ হইলে উহা রহিত

করেন। কিন্তু অন্যান্য সরিকের অংশে মাছধরা রহিত না হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয়। ইহাতে অবশেষে জলার খাজনা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া উৎসবের সময় দানে ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অনুগত কাওরাদির ব্রাহ্মদলের কিরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল তাহা এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় ও প্রচারোৎসাহ তাঁহার লিখিত পত্রাদিতে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। এজন্য তাঁহার অন্যতম সঙ্গী শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্যের নিকট লিখিত পত্র হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এ অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি।

"এখন আমার শরীর অনেকটা ভালর দিকে। যখন বিশেষ বিষম অবস্থা তখন রমাকান্তকে লিখি, তোমাদিগকে জানাবার জন্য যে, তোমরা আমার জন্য উপাসনা কর। হৃদয়ের বিশ্বাসই এই ছিল যে, তোমাদের কামনায় আমার অনেক শান্তি হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছে। এখন দুর্ব্বলতা মাত্র আছে। অন্য কোন উপদ্রব নাই। বোধ হয় পৌষ মাসের ২।৪ দিন তক তথায় পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু ডাক্তার ও পরিবারস্থ সকলেই আরও দুইমাস পর্য্যন্ত কাওরাদি যাইতে নিষেধ করিতেছে। এই নিষেধ প্রতিপালিত হইতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা মাত্রই নাই।

"প্রিয়বর, এখানে সেখানে যথায়ই থাকি না কেন, কিন্তু তোমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিলে মনে যে আশা ও শান্তি থাকে এমন আর কিছুতেই নয়। তাই ইচ্ছা হয় নিরন্তর তোমাদের নিয়ে থাকি। আমার ভাল মন্দ যত তোমাদের নিকট। তোমাদের যদি উৎসাহিত দেখি বা তোমাদের উৎসাহসূচক বাক্য শুনি তবে অন্তরে যেন সূর্য্যালোক উপস্থিত হয়, মৃত প্রাণে জীবন পাই, ভগ্ন শরীর সুস্থ

হয়। তাই বলি বাছা, এখন উৎসব নিকটবর্ত্তী, তজ্জন্য প্রস্তুত হও। তুমি, অধর, দয়াল, ভারত, রামসুন্দর, এবং নিতাই সকলে মিলিয়া একান্ত ব্রহ্মকৃপার দিকে চাহিয়া থাক। সাহেবের কুত্তাগুলি যেমন অন্যদিকে মন দেয় না, কেবল প্রভুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন, ইসারা করেন, প্রাণপণে সেই কার্য্য করে, এইরূপ তোমরাও এখন অন্য গোলমালের দিকে মন না দিয়া কেবল সেই কৃপার ভিখারী হও। এই উৎসব তোমাদের জন্মোৎসব হইবে। গর্ভাবস্থা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন অধ্যাত্ম জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এটি তোমাদের অবগতির জন্য লিখিলাম। যদিও পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া যায় না, দিন ভাল কি মন্দ তজ্জন্য সবুর করা যায় না, তথাচ এটি অধ্যাত্ম জন্ম। এখানে মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিবার মতন অজ্ঞভাবে জন্ম হইতে পারে না। এ জ্ঞানরাজ্য, দীপ্ত রাজ্য; এখানে অন্ধকারই আলো হইয়া দাঁড়ায়, জন্মের পূর্ব্বক্ষণে প্রসববেদনা হয়। তোমরাও দেখিবে এই পৌষ মাস হইতে না হইতে বেদনা আরম্ভ হইবে। বেদনার সময় যেমন আত্মীয় বান্ধবের ধন দৌলত কিছুর দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল কেমন করিয়া প্রসব হইবে সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, ইহাও সেইরূপ। এটি আমার কল্পিত কথা নয়। ব্রহ্মকৃপা যাহা জানান তাহাই জানাইতেছি। অবশ্য সকলের সমানে জন্ম না হইতে পারে, কিন্তু ১।২।৩ এই এইরূপ উৎসব আসিতে আসিতে সকলকেই জীবন্ত অবস্থায় পাইব, এই আশা দিতেছেন। তাই সাহসপূর্ব্বক তোমাদের এই সংবাদ দিলাম।

"আমার আশীর্ব্বাদ জন্য ভাবিত হইও না। আশীর্ব্বাদ করি মঙ্গলমত মিলিতহৃদয়ে উপাসনাদি করিয়া ব্রহ্মরাজ্য আবাদ কর,

ব্রহ্মের জয়ধ্বনি ঘোষণা হউক, ব্রহ্মকৃপা হৃদয়ে হৃদয়ে বাস করুক, দেশ উদ্ধার হউক।" ১২৯৯।২৪শে অগ্রহায়ণ।

বৎসরের শেষ দিনে লিখিত একখানি পত্র হইতে ;—

"আজ বৎসরের শেষ দিন, নিকাশের দিন। আশা করি জ্ঞাতসারে তোমরা সকলে সমবেত না হইয়া, ব্যক্তিগত ভাবে আত্মচিন্তা আত্মস্মৃতি লইয়া যার যার মত নির্জ্জনে জীবনের নিকাশ করিয়া, প্রাণব্রহ্মের দপ্তরে পরিষ্কার হইয়া, যাহা অপদার্থতা তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক জীবনকে ধৌত করিয়া, প্রাণারামে বাস করিয়া, ১লা বৈশাখ আগামী কল্য বুধবার প্রাতে নবরাগে রঞ্জিত হইয়া, নব হৃদয় ও উৎসাহ লইয়া, নবপ্রেম-সম্ভোগের আশায় প্রাণের প্রিয়গণ তোমরা কাওরাদি ব্রহ্মমন্দিরে চলিয়া আস। প্রাতে বিলম্ব করিও না, তাহাতে অনুরাগ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"এবার দাতা যেমন নবভাবের অগ্নি পুনরায় জ্বালিবার আভাস দিয়াছেন, কিছু কিছু আমাদের সকলের জীবনেই তাহা হইয়াছে। উৎসবাদির মধ্যে, মাঘোৎসবের প্রচারে, বসন্তোৎসবে নূতন অনন্ত জীবনের ভাব, পরলোকের ভাব বিশেষ জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে তিনটি লোক পরলোকে গেল। ইহাদ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণ হইল। জগত যাহা দেখে দেখুক। আমাদের দাতার মঙ্গল দান আমাদের ভূকম্পের গানেও দেখাইয়াছেন।

"সকলি মঙ্গল তোমার প্রাণ, অমঙ্গল নাই তব বিধান, জগত ভরিয়ে সে গীত গায়, সে গীতের তানে, জাগে জীবমানে, মৃত্যুতে কেমন অমৃত ধাম।" মৃত্যুতে অমৃত বাস্তবিক ইহার সাক্ষ্য দিতে এবৎসর আমরা সকলেই ক্ষমবান হইয়াছি। এ বৎসর বাস্তবিক আমাদের পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে।" *

* এই চিঠিখানি ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পরে লিখিত।

"তোমাদের পত্র পাইয়াছি, বৎস। ভগ্নোৎসাহ হইবে না। দাতা যেরূপ দেন তাহাই ভোগিবার বিষয়। বেশী কোথা পাইব? ফল কথা ক্ষুধা থাকিলে সিদ্ধ ভাতই উত্তম লাগে। তাই বলি ক্ষুধা প্রদীপ্ত রাখিবা। তাহা হইলেই রুচির সহিত ভোজন হইবে। এখানে বেশী লোকজন নাই। যাহা আছে তাঁহারাও আমাদের জানেন না। আমাদের ভাব, বিশ্বাস ধরিতে সম্পূর্ণ পারেন কি না সন্দেহস্থল। তাই এখানেও একই দশা। তথাচ দাতা সংকীর্ত্তন করাইবার জন্য একটি সঙ্গীত লিখাইলেন। তাহা নাগরি অক্ষরে লিথোগ্রাফ দ্বারা এখানে দুইশত পরিমাণ ছাপা করাইয়াছেন। বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা ছাপিয়া দিবার জন্য কলিকাতা দিয়াছি, আসিলে কয়েকখানা পাঠাইয়া দিব। "হে ভগবান" এই সুর দেওয়া হইয়াছে। কতদূর কীর্ত্তন হবে জানি না, তবে ভরসা এই যখন এত করাইয়াছেন তখন শেষ কিছু অবশ্য দিবেন। এখানে সবশুদ্ধ তিন চারিটি লোক বিনা ব্রাহ্ম নাই। তাঁহাদের পরিবারবর্গসহ মেয়ে পুরুষে বার তের জন হইবে। একে হিন্দী গান, তাহাতে প্রায় কেহ গায়ক নহে। ভাবিয়াছি মাত্র কীর্ত্তনের মত গাহিয়া কাগজ সকল বিলি করিব। দাতা জানেন শেষদান।

"তথাকার (কাওরাদির) উৎসবে নিশান, সাইন বোর্ড, আলো ইত্যাদির যথাবিধি ব্যবস্থা করিবা। পূর্ব্বদিনের ও উৎসবের দিনের বিকালের ও পরদিনের আহারীয় সমস্ত বস্তু তোমাদের নিজেদেরই তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। আমার পাক-ঘরে হাতা হাতি করিয়া লইবা। উৎসবের দিনে মধ্যাহ্নে দধি চিড়া খাইবা। এ সকল নায়েবকেও লিখিয়াছি। আপন কার্য্য জানিয়া আপনারা যাহা হয় করিয়া গড়িয়া লইবা ও দিবা।

"ভাই নিতাই, শেষ উৎসবে আমার উপস্থিত ইচ্ছা করিয়াছ। ইচ্ছামত আমারও অনিচ্ছা নাই। ভাই, কেবল উৎসবের অনুরোধে আমাকে এখানে থাকিতে হয় নাই, ডাক্তার আদিও সকলেই শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। তাই থাকা। বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসব করিবা। এবং আমাকে সংবাদ দিবা। দাতা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, করিবেন।"

দূরে থাকিয়াও সকল বিষয়ে কিরূপ সুব্যবস্থা করিতেন, উপরি লিখিত পত্রে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

"৩০শে চৈত্র বিকালের উপাসনায় গত সনের জীবন আলোচিত হইল। প্রার্থনা, আরাধনা, কৃতজ্ঞতা এই ত্রিবিধ বিষয়ই হইয়াছিল। প্রার্থনার মূলে ছিল—"বৃক্ষসকল যেরূপ এই বসন্তসমাগমে পুরাতন পত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া নবীন পল্লবে শোভিত হয় এবং শীতের নীরস জীবন অতিবাহিত হইয়া নবীন রসে পূর্ণ হয়, এইরূপ আমাদের এই মানব প্রাণ নববর্ষে পুরাতন সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া নবীনপত্র, নবীনরস দ্বারা পূর্ণ করিয়া নবীন জীবন করিয়া লও।" উত্তরে জানাইলেন এই যে বৃক্ষসকলের নবরস হয়, ইহার কারণ এই বৃক্ষসকল কেমন সহিষ্ণু হইয়া শীত আতপ ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করে। তাহা দেখিতেছ। এই সহিষ্ণুতার গুণে তাহারা প্রতিবর্ষে নবীনরস, নবীনপত্র ও সজীবতা প্রাপ্ত হইতেছে। তোমরা যদি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পার, তবে তোমাদের জন্যও তাহা ধরা রহিয়াছে, অবশ্য পাইবে। কিন্তু তোমাদের সহিষ্ণুতা কৈ? একটুকু ধূলা গায়ে পড়িলে আচ্ছন্ন হয়ে যাও, এ অবস্থায় সেই নিত্য জীবন ও নিত্য যৌবনের আশা কেমন করে করিতে পার? যদি বাস্তবিক নবীন জীবন চাও, তবে বৃক্ষের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি

রাখিবে। তাহাকে আদর্শ করিয়া জীবন পথে চলিতে থাক, অবশ্য পাইবে।

"গতকল্য ১লা বৈশাখ দিনে সেই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন। এবং নানা দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। যেমন, বৃক্ষগণ কেমন সহিষ্ণু! তাহাকে যে ছেদন করে তাহাকেও কোন দুঃখ দেয় না। আর যতক্ষণ খাড়া থাকে ততক্ষণ আপন মূলদেশস্থ শিকড়সকল সেই মৃত্তিকার নিম্ন দিকে স্থির ভাবে থাকিয়া চুম্বন করিতে থাকে। এ জন্যই শীতের শুষ্কতার পর যখন বসন্তের রসালতা পায় তখনই অন্তরপ্রবাহে রসসকল গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধ ও পল্লবিত হয়। এই বৃক্ষ যদি মূল প্রথিত করিয়া অন্তরের প্রত্যেক শিরাদ্বারা রস আকর্ষণ না করিত, তবে বাহিরের স্নিগ্ধতা হইত না। এই বৎসরই চক্ষুর উপর দেখিয়াছ ফাল্গুন চৈত্র দুই মাসমধ্যে মেঘ নাই। বাহিরের স্নিগ্ধতার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও বনে বাগানে নানা বৃক্ষ-সকলে পুরাতন পত্র বদলাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কিশলয় ও স্নিগ্ধ পুষ্পাদি হইতে আরম্ভ করিল। মেঘের সাহায্য পরে। এইরূপ অন্তরে যদি প্রেমরস না থাকে তবে বাহিরে ছায়াশূন্যতা বিনা স্নিগ্ধতার কারণ কিছুই থাকে না। মূল যদি স্নিগ্ধ না থাকে, তবে শত মেঘও স্নিগ্ধ করিতে পারে না। অতএব বৃক্ষের ন্যায় নবীন জীবন পাইতে যদি বাস্তবিক ইচ্ছা থাকে, তবে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হও, অর্থাৎ বৃক্ষজীবন আদর্শ কর।

"বৃক্ষের ন্যায় একস্থানে খাড়া থাকিলেই বৃক্ষজীবন লাভ হইল তাহা নহে, বৃক্ষের অন্তঃশিরা যেরূপ মৃত্তিকার রসের জন্য লালায়িত হইয়া ক্রমাগত নিম্নদিকে যায় তোমাদের জীবনেও তাহা চাই। তা বিনা বৃক্ষজীবন সমগ্র লাভ করা যায় না। আর দেখ বৃক্ষ

এই ভাবে মৃত্তিকার দিকে পূর্ণ আশা, পূর্ণ নির্ভর করে বলিয়া বীজ হইতে প্রথমে যেমন অঙ্কুর হইয়া থাকে, যত দিন বাঁচে তত দিনই অঙ্কুর হইতে থাকে, অঙ্কুর হওয়া আর থামে না, এইরূপ মানবগণ বৃক্ষজীবন যাপন করিতে পারিলে যখনকার যাহা আবশ্যক পাইবে। অতএব বন্ধুগণ এক বার বৃক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতে ১৩০২ সন সন কাটাইতে হইবে।" ১৩০২।২ বৈশাখ।

"যে প্রকার দেখিতেছি তাহাতে ষোলআনা ভোগের সম্ভাবনা কিছুতেই নাই। তবে দাতা যাহা দেন তাহাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলেই উৎসবানন্দ ভোগ হইল। তাঁর যেমন অংশ নাই, এমন তাঁহার দানেরও অংশ নাই। সবই ষোল আনা, এই বিশ্বাস জাগাও। কিন্তু সকলের সঙ্গে আজ কাল মধ্যে দেখা না হইলে বাঁচি না। আমরা কাম কাম যত করি, কাম ততই প্রেম করে, সঙ্গ ছাড়া করিতে চায় না।

"ভাইসকল, প্রাণ খোল। না হয়, উৎসবে প্রাণ খুলিয়া চল কাঁদি। তবে ত অনেক কুয়াসা কাটে, অনেক নিরাশায় আশা পাওয়া যাইতে পারে। কিছুতেই প্রাণ খোলবে না, নাববে না, তবে আমরা কি হইলাম? ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম।"

"নিয়মের মধ্যে অনিয়ম, সসীমের মধ্যে অসীম, এইটি খুব ক'রে দেখা চাই। জগতের বিচিত্র ব্যাপারই এক মহিমান্বিত প্রাণব্রহ্মের জীবনী, তাহা আমার লেখা নয়, অঙ্কিত জগত রাজ্যে। এই জগত-রাজ্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম, স্থির যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি, ফল পুষ্প হওয়া, কিন্তু কত পত্র হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমাদের মধ্যে এবার এই অনিশ্চিত স্বভাবের মধ্যে নিশ্চিৎ স্বভাব যে আছে, নূতন করিয়া তাহা জানাইয়া জানাইয়া বুঝাইবেন।

"আমাদের আশা পূর্ণ হয় এই বিশ্বাস বুকে লইয়া যে যেখানে আছি সেখান হইতেও আশা করিতে থাকি। কি প্রকার পূর্ণ করিবেন জানি না। চিরকাল আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন, এই প্রত্যেকের জীবনের পরীক্ষিত সত্য।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাতৃভক্তি ও পারিবারিক জীবন।

১। মাতৃভক্তি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দয়ার স্রোতে বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন তাহার মূল তাঁহার জননীর হৃদয়ে নিহিত ছিল। রামমোহনের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং কেশবচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তির মূলানুসন্ধান করিলেও তাঁহাদের জননীর স্মৃতিই আমাদের মনে উদিত হয়। এ সকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হয় সন্তানের উপর জননীর প্রভাব অব্যর্থ। অতএব সন্তানের সকল সৌভাগ্যের মূল জননীর প্রতি, ধার্ম্মিক সন্তানের ভক্তিস্রোত অবশ্যই প্রবাহিত হইবে। কালীনারায়ণের মাতৃভক্তি এবং মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ আদর্শস্থানীয় ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মাতৃবিয়োগে তিনি "মাতৃদেবী" নামক একখণ্ড পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। উহার উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন—

"মা বলিতে আমার গর্ভধারিণী মা যশোদাদেবী এবং আমার চারিবর্ষ বয়সাবধি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্রভাবে আমার দেহ মন লইয়া খেলা করিয়াছেন যে মা ভাগিরথী দেবী। এই দুই মাইই আমার সর্ব্বস্ব। অতএব আমার প্রাণের ভক্তি-বাচক এই মাতৃদেবী খানা প্রেম সোহাগের অবতার মাতৃদেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে অনন্ত কোটি প্রণিপাতপূর্ব্বক উৎসর্গ করিলাম।"

মাগো, প্রাণারাম পূর্ণব্রহ্মের মহাদান যে আপনাদের পাদপদ্ম, ইহা যেন আমার চিরজীবনের আলো হইয়া আমাকে 'অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে থাকে, এই বর চাই। প্রাণব্রহ্ম তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সেবকাধম শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

"মা, পূর্ণব্রহ্মের মহাদান, মার স্নেহমমতা জীবনপথের আলো, এবং ভগবদ্ভক্তির সহায়" এই বোধ কালীনারায়ণের মাতৃভক্তির মূল; তাই তিনি তিনি মাতৃ-দেবী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন;

"ওঁব্রহ্ম বলি মন মাতৃগুণ গাও
ব্রহ্মই যে মাতৃরূপ সেদিকেও চাও।
মাতা পিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন,
সম্বন্ধ রূপেতে বদ্ধ ব্রহ্ম সনাতন।
যত মাতা, যত পিতা, যত গুরুজন,
এক অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁর রূপে মার রূপেরি আলয়,
রূপে রূপে ধরা ভরা মাতৃরূপময়।
গুণময় প্রাণব্রহ্ম নিত্য গুণ দিয়ে,
গড়েছে মায়ের রূপ উপমা ছাড়ায়ে।"

চারি বৎসর বয়সে গর্ভধারিণী মার কোল ছাড়া হইয়া বালক কালীনারায়ণ পালয়িত্রী মাতার নিকট আসেন। তদবধি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কত সেবা, যত্ন ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়াছেন! রক্তের সম্পর্ক বিনা এমন আকর্ষণ কিরূপে সম্ভবপর হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মটানই সকল আকর্ষণের মূল।" জগতের সর্ব্বত্র নরনারীতে এই আকর্ষণ কি অদ্ভুত কার্য্যই না সংঘটন করিতেছে! ফলতঃ উহাই মাতৃহীনের প্রাণে মাতৃভক্তি, এবং সন্তানহীনার অন্তরে প্রবল সন্তান-বাৎসল্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

কালীনারায়ণ যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে মাতার অত্যন্ত বিরাগভাজন হন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মাতৃভক্তির হ্রাস হয় নাই। মাতা বয়স্ক পুত্রকে প্রহারে উদ্যতা হইলেও পুত্র হাসিতে হাসিতে শরীর পাতিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"তবু মার স্পর্শ লাভ হউক।" এইরূপে আব্দার করিয়া তিনি মার বিরাগ ভঞ্জন করিয়াছেন।

কালীনারায়ণ, দূরে থাকুন আর মার নিকটে থাকুন, সর্ব্বদা ইষ্টনাম জপের ন্যায় মার নাম ও গুণ স্মরণ করিতেন। নিকটে থাকিলে প্রতিদিন মার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া বৃদ্ধা মাতা উৎফুল্লমনে ইষ্টদেবের চরণে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

ভাটপাড়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া কালীনারায়ণ যখন ঢাকায় সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন মাতা সময় সময় ঢাকায় সন্তানের নিকট আসিতেন। তাঁহাদের মিলনে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিত। ভাগীরথী দেবী ঢাকা আসিলে স্বহস্তে বিবিধ বস্তু রন্ধন করিয়া সন্তানকে খাওয়াইতেন। তিনি রন্ধনে সিদ্ধহস্তা ছিলেন।

সন্তানের আহার না হইলে তিনি মুখে অন্ন দিতেন না। আমের দিনে সন্তানের পাতে আম না দিয়া কখনও তিনি আম খাইতেন না। একবার আমের সময় কালীনারায়ণ ভাটপাড়া যাইতে অসমর্থ হওয়ায় মার আম খাওয়া বন্ধ ছিল। কালীনারায়ণ আম খাওয়ার জন্য মাকে অনেক অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

বৃদ্ধাবস্থায় একবার ভাগীরথী দেবী তীর্থদর্শনে গমন করেন। কালীনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন বৃদ্ধার শরীরের এমন অবস্থা যে তাঁহারই সেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সন্তানের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, সন্তানের স্নান আহার না হইলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন, তাঁহার সেবার সুযোগ দিতেন না।

১৩০১ সনের মাঘমাসে ভাগীরথী দেবী অত্যন্ত পীড়িতা হন। তখন কালীনারায়ণ কাওরাদি ছিলেন। মার পীড়ার সংবাদ লইয়া বাড়ী হইতে একটী লোক তাঁহার নিকট গমন করে। তখন মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী। এজন্য উৎসবের পরে গিয়া মার সঙ্গে দেখা করিবেন এই কথা বলিয়া লোকটীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ৬ই মাঘ মার অধিকতর কাতরতার সংবাদ লইয়া পুনরায় লোক আসিলে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। গিয়া মার অবস্থা একটু ভাল দেখিলেন। মাঘ ও ফাল্গুন মাস ভালভাবেই কাটিল। কিন্তু চৈত্র মাসে রোগের পুনরায় বৃদ্ধি হইল। এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ২০শে বৈশাখ (১৩০২ সন) তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ঘোরতর কাতরতার মধ্যে একদিনের জন্যও বৃদ্ধার দৈনিক সন্ধ্যা পূজা কি একাদশীর উপবাস বন্ধ হয় নাই।

কালীনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের লোক, এ নিমিত্ত তিনি মাতৃশব বহন করিতে অধিকার পাইলেন না। তাঁর হিন্দু আত্মীয়গণ শব শ্মশানে লইয়া গেলেন। কিন্তু শব শেষ-শয্যা হইতে শ্মশান-শয্যায় আনীত হইলে যে-সকল পুরাতন শয্যা পরিত্যক্ত হইল কালীনারায়ণ উহাই বাঁধিয়া লইয়া শ্মশানে গমন করিলেন। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"উহারা যেমন মাতৃদেবীপরিত্যক্ত নশ্বর দেহ বহন করিয়াছে, আমিও যে তাঁহার পরিত্যক্ত এই নশ্বর শয্যা বহন করিয়া আনিতে পারিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। কিন্তু মা আমাকে নিরাশ করিলেন না। বাতাস যখন শ্মশানাগ্নি বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, তখন কোন কোন মহাত্মা আমার মোট হইতে চাটাই সকল লইয়া আড়াল দিলে, বায়ুর আক্রমণ নিবারিত হইয়া, শ্মশানাগ্নি সুন্দর মত জ্বলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি মহানন্দে বার বার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ ও ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ ধ্বনি করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন সকলে চিতাগ্নিতে সপ্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে লাগিল, তখন আমিও শ্মশান-বন্ধুদের মত লইয়া চন্দনাদি কাষ্ঠ ঘৃত-সংলগ্ন করিয়া মাতৃচিতাযজ্ঞে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সকলের সঙ্গে শ্মশান ধৌত করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পরে কয়েকটী চিতাভস্ম সংগ্রহ-পূর্ব্বক গৃহে আসিলাম।"

মাতৃবিয়োগের পর কালীনারায়ণ একমাস মৃত্তিকাতে শয়ন ও নগ্নপদে বিচরণ করেন। মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করেন, ভাটপাড়ার নিকটবর্ত্তী নানা গ্রামের লোকদিগকে আহার করান, ও দীন দুঃখীদিগকে দান করেন। জ্ঞাতিগণ হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করেন—তিনি তাহারও ব্যয় বহন করেন। তৎপর যখনই মার কথা উঠিত তাঁর চক্ষু হইতে দর্ দর্ ধারে অশ্রুপাত হইত। বৃদ্ধা জননীর

অভাবে বৃদ্ধসন্তানের এই প্রকার শোক ও মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইত। কেবল শোকের জন্য এরূপ করিতেন তাহা নয়, মাতৃগুণ স্মরণ করিয়া মনে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হইত তাহাতেই আত্ম-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। মাতৃদেবী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—

"যেই দিন মা গো তুমি গেলে পরলোকে,
শোকের বদলে বুক ভরে গেল সুখে।"

ইহলোকের মার স্নেহের মধ্য দিয়া অনন্ত পরলোকের আশ্রয় পরম জননীর স্নেহের প্রতি তাঁহার সত্য দৃষ্টিলাভ হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাই বোধ হয়। অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"তুমি র'লে পরলোকে পরম সহায়,
তোমাকে সহায় পেলে আমাকে কে পায়?
সেই হ'তে কি আশাতে প্রাণে হাসি আমি,
আগে জানে ব্রহ্ম আমার, আর জানো তুমি।
তুমি মা গো জীবনের অনন্ত সহায়,
এই মহা বল প্রাণে জাগে যে সদায়।"

ইহলোকে যে মার উপর কত নির্ভর করিয়াছেন, সেই মা পরলোকেও তাঁহার সহায় আছেন, এই বিশ্বাস পরলোক সম্বন্ধে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

১৩০৮ সালের মাতৃস্মৃতিমন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাতৃগুণাবলী-স্মারক একটি গীত গান করিয়াছিলেন। উহা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। এস্থলে উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নরাধম দাসে রাখি ধরাবাসে,
তুমি গেলে মা গো আপনার দেশে,

চিন্ময়ী হইয়ে, চিতে বিরাজিয়ে,
এদেশ সেদেশ কর একাকার।
চিতাভস্মরূপে মন্দিরে পশিয়ে
তোর দাসে মা গো শ্রীচরণ দিয়ে
বিভূতি-ভূষণ সর্ব্বাঙ্গে মাখা'য়ে
কালো কালী সাদা করগো এবার।"

দেহধারী মার তাঁহার অভাব হইল, কিন্তু চিন্ময়ী মার অভাব কখনো হয় নাই। সেই পরম জননী তাঁহার হৃদয়ে চিরবিরাজমান ছিলেন। বিশ্বাসনেত্র প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাঁহার এদেশ সেদেশ একাকার, এবং নিত্য নূতন আলোকে তাঁহার চিদাকাশ সমুজ্জ্বল রহিল।

মাতৃদেবীর শেষাবস্থায় যাহারা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহার একখানি ফটো গ্রহণ করেন, তাঁহাদের প্রতি কালীনারায়ণের কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। মাতৃবিয়োগের পর মাতৃস্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহার অর্থব্যয়ে পুষ্করিণী-খনন, পথপার্শে বৃক্ষ-রোপণ, সেতু-নির্ম্মাণ, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে।

মাতার জীবদ্দশায় কখনও রোগ হইলে কালীনারায়ণ ঔষধ সেবন করিতে চাহিতেন না, বলিতেন "মায়ের কাছে লইয়া যাও, মার চরণামৃত পান করিলেই ভাল হইব।" একবার ঢাকাতে খুব কাতর হন, কিছুতেই ঔষধ খাইবেন না মার চরণামৃত পানের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করেন। অবশেষে সেবক গুরুদাসকে চরণামৃত আনিবার জন্য ভাটপাড়া মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। গুরুদাসের নিকট কালীনারায়ণের অভিপ্রায় শুনিয়া মাতা প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই, বলিয়াছেন "কালীনারায়ণের কি পাগলামি যে চরণামৃত পানে

রোগ সারিবে।" কিন্তু গুরুদাসের হাত এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চরণ-ধৌত জল দিয়াছেন, এবং গুরুদাস উহা শিশিতে ভরিয়া কালীনারায়ণকে আনিয়া দিয়াছেন। কালীনারায়ণ মাতৃ-পাদোদক ভক্তির সহিত সেবন করিয়া আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দাস বলিয়াছেন—"একদিন রজনীতে বৃদ্ধা অজ্ঞাতসারে ক্ষুদ সিদ্ধ করিয়া সন্তানের পাতে দিয়াছিলেন। অতি বার্দ্ধক্য জন্য বুঝিতে পারেন নাই চাউল কি ক্ষুদ। কিন্তু কালীনারায়ণ উহাই তৃপ্তির সহিত আহার করেন, আর জিজ্ঞাসা করিলে "বড় ভাল হইয়াছে" এই মত প্রকাশ করেন। বৃদ্ধা পরদিন যখন জানিতে পারিলেন সন্তানের পাতে ক্ষুদের যাউ দিয়াছেন তখন কেবলই খেদোক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না "মার হাতের ক্ষুদের যাউ কিরূপে সন্তানের নিকট অমৃতের ন্যায় বোধ হয়।"

কাওরাদির শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্য বলিয়াছেন—"কাওরাদির নিকটস্থ জয়ধরখালির একটি ভিক্ষুণী বৈষ্ণবী প্রজার কালীনারায়ণের গর্ভধারিণী মাতা যশোদা দেবীর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকে মার মত ভক্তি করিতেন। সাক্ষাৎ হইলে ঐ বৈষ্ণবীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেন, এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। একবার ঐ বৈষ্ণবীর সমস্ত দ্রব্যাদি চুরি হয়। বৈষ্ণবী কালীনারায়ণের নিকট আসিয়া সব বিষয় জানাইলে তিনি ঘটী, বাটী, চাউল, ডাইল, বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত কিনিয়া দিলেন। ঐ বৈষ্ণবীর তামাক-সেবন অভ্যাস ছিল এবং তাহার হুকাটিও চুরি গিয়াছিল। বৈষ্ণবী বলিল "বাবা, সবইত দিলে, কিন্তু আরও একটি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব

আছে, উহা না হইলে আমার চলে না।" শুনিয়া কালীনারায়ণ একটি হুকা ও অবশেষে হুকা পরিষ্কারের একটি লোহার শিক কিনিয়া দিয়া বৈষ্ণবীর সকল অভাব পূর্ণ করিলেন।"

জমিদারের উপর একটি বৈষ্ণবী প্রজার এই প্রকার মাতৃযোগ্য অধিকার এবং মাতৃভক্তি লাভ একটা বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই বৈষ্ণবীকে দেখিয়া অন্যান্য প্রজা "কর্তার মা" বলিয়া রহস্য করিত।

কালীনারায়ণের ব্রাহ্মধর্মগ্রহণে তাঁহার মাতা সর্ব্বদা প্রতিবাদ ও তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু কালীনারায়ণ মার রাগে অনুরাগ মিশ্রিত দেখিয়াছেন, মার প্রতি কখনও অসন্তোষপ্রকাশ বা দোষারোপ করেন নাই। অন্যের অসন্তোষপ্রকাশ শুনিলে বলিতেন—"মার এই শাসন কখনো মন্দের জন্য নয়, এমন শাসন আছে বলিয়াই আমার ধর্ম্মবুদ্ধি ম্লান হয় নাই। নতুবা কোন্ পাপবুদ্ধি প্রবল হইত কে বলিতে পারে? জননীর ধর্ম্মের প্রভাবই এ জীবনের ধর্ম্মভাবকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।" লিখিয়াছেন—

"বলিতে কি পারা যায় কি যে আছে কত,
আমার জীবন মা'র জীবনে গঠিত।
এই মা'র কোলে থাকি হইয়াছি যা
জানেন অন্তর্যামী, আর জানে মা।"

শেষ অবস্থায় মার একখানি ছবি সর্ব্বদা শিয়রে রাখিতেন, যেন ঘুম হইতে উঠিয়াই মার মুখ দেখিতে পান। কন্যারা যদি পরিহাস করিয়া বলিতেন "বাবা, তুমি এই বৃদ্ধ বয়সেও মা মা করিয়া এত ব্যস্ত হও কেন?" বলিতেন "মা, তোমরা জান না নিদ্রা হইতে জাগিয়া মার মুখ দেখিলে আমার প্রাণ কত শীতল হয়।" এই কথা বলিতে

বলিতে তাঁহার ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিত, ঝর্ ঝর্ করিয়া নয়নে জলধারা বিগলিত হইত। মার গুণের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে এমন উৎসাহিত হইতেন যেন শতকণ্ঠে বলিলেও মনের ভাব ব্যক্ত হইত না।"

মাতৃবিয়োগের পর মার ব্যবহৃত দ্রব্যে আপনার গৃহ সজ্জিত করিয়া এমন মাতৃস্মৃতিতে পূর্ণ করেন যে, সে স্থানে প্রবেশ মাত্র সদ্য মাতৃভাব অন্তরে জাগ্রত হইত।

পোষ্যপুত্র হইয়াও যিনি মাতৃভক্তিতে এমন অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং মা ডাকিয়া নিঃসন্তানার প্রাণে অপত্যস্নেহ আনয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি বার্দ্ধক্যেও সর্ব্বজ্ঞানবুদ্ধিবিবর্জ্জিত অসহায় শিশুর মত কেবলই মা মা বলিয়া ডাকিয়া মা নামের প্রকৃত মধুরতা অনুভব করিতেন, তিনি কখনও সামান্য মনুষ্য নহেন। *

কালীনারায়ণ তাঁর বিদেহী মার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন—

"জড় শরীরেতে মাতা ছিলে এতদিন,
এখন হয়েছ মুক্ত নিবন্ধবিহীন ;
যদিও এখানে তুমি ছিলে মুক্ত ভাবে
তথাচ শরীরে বদ্ধ জড়ের স্বভাবে।
চক্ষের আড়ালে মোরা রয়েছি যখন
অমঙ্গল চিন্তি চিন্তা করেছ তখন।
এখন তোমার বংশ যে যেখানে আছে
আশীর্ব্বাদ দেও তুমি থাকি তার কাছে।
ইহপর ব্যাপিয়া হয়েছে অধিকার
বাসনা পূরিতে কষ্ট নাহি হয় আর।"

* শ্রীযুক্তা বিমলাদাস-রচিত পিতৃস্মৃতি।

"এখানে যেমন মা গো সম্পূর্ণ সংসারে
আনিয়ে পালিয়ে মা গো বাড়ালে আমারে ;
সেখানেও সেইরূপ করি আয়োজন
আমাকে কি শ্রীচরণে নিবেগো তখন ?
এথা ওথা দুদিকেই কিছু কিছু আছে
এমন অমৃত-রাজ্য সৃজন হতেছে।
পৃথিবীতে ঢালি মা গো সোহাগের ঘরা
অমৃতেও দেখিতেছি সে সোহাগ ভরা।
নিশ্চিন্ত করিবে মোরে এই প্রয়োজন,
দুঃখের ছায়াতে কর সুখ আয়োজন।
কর মা গো যাহা ইচ্ছা যাহা মনে লয়,
তোমার ইচ্ছাই ইচ্ছা, তব জয় জয়।
কিন্তু মা গো একটি কথা করি নিবেদন,
শান্তি দিতে এ হৃদয়ে রেখো শ্রীচরণ।

২। পারিবারিক জীবন।

তাঁহার পুত্র কন্যাগণের প্রায় সকলেরই সবর্ণে বিবাহ হয়, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ অসবর্ণে স্থির হয়। ইহাতে আত্মীয় স্বজনগণ আপত্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় কাহারও পরামর্শে বিচলিত হন নাই। তিনি শুনিয়া বলিলেন "এতদিন কেবল বক্তৃতায় আর কথায় জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু জীবনের কার্য্যে দেখাইতে পারি নাই। স্বজাতিতে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ভক্ত নাম লইতেছিলাম দেখিয়া সর্ব্বদর্শী সময়ে সতর্ক করিয়া দিলেন, ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা? আমি কি বলিয়া আজ তাঁর

কাছে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইব বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে মঙ্গলময়ের এই বিধানে কোন আপত্তি না করিয়া কেবল আনন্দ কর, এই আমি চাই।" * তাঁহার কথায় লজ্জিত হইয়া আর কেহ কোন প্রত্যুত্তর করেন নাই।

তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। এমন কি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদিগকেও কখনও কোন কাজ করিতে বাধ্য করিতেন না; বলিতেন, "এতবড় পরিবারে সকলে আমার মতানুযায়ী হইয়া চলিবে আমি এরূপ আশা করিতে পারি না। আমার মতে চলে ভাল, না চলিলে বাধ্য করিবার আমার কোন অধিকার নাই।"

পুত্র কন্যাগণের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ছিল। বিবাহিত কন্যাগণ অবকাশকালে তাঁহার গৃহে আসিলে তাঁহাদের আগমনকে তিনি ভগবানের অযাচিত দান মনে করিতেন। আহারকালে কত সময় সোহাগভরে কাছে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতেন। কখনও বা সুমিষ্ট ফল মূল এবং মিষ্টদ্রব্য আনিয়া তাঁহাদের হাতে দিতেন। সন্তানকে এমন আদর যত্ন এক জননী ভিন্ন আর কে করিতে জানে? তাঁহাতে পিতৃমাতৃভাবের সুন্দর সমন্বয় ছিল। তাইত মাতৃহারা সন্তানগণ তাঁহার স্নেহগুণে মাতৃশোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

একদিকে যেমন কন্যাগণের প্রতি এই প্রকার গভীর স্নেহ, পক্ষান্তরে পিত্রালয় পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে কখনও তাঁহাদিগকে আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিতেন না। বিদায়কালে স্নেহে গদগদ হইয়া দুই হস্তে তাহাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্নমুখে

* শ্রীযুক্তা বিমলাদাস-রচিত পিতৃস্মৃতি।

বলিতেন, "যাও মা আপনার গৃহে, এতদিন হয়ত আত্মীয় স্বজন কত অসুবিধা, কত বিশৃঙ্খলা ভোগ করিয়াছে, তাই আপন সংসার ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি না।" এইরূপ সকলদিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

জামাতাদিগের প্রতি তাঁহার মধুর ব্যবহার দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হইত। তাঁহাদের কুলশীল মান মর্য্যাদা ভেদে স্নেহের তারতম্য তিনি করিতেন না। সকলকে পুত্রবৎস্নেহে সুখী ও আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষে শ্রাদ্ধবাসরে কোন জামাতা বলিয়াছিলেন—"বৎসরান্তে একদিন তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া কেমনে তৃপ্ত হইব? প্রতিদিন তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইলেও যে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। মনে মুখে মিলিয়া কেবল তাঁহারই কথা বলিতে ইচ্ছা করে। এ কথার ত আর শেষ নাই। তাঁর কথা বলিয়া সুখ, শুনিয়া শান্তি ও আরাম। এমন জন আর কোথায় পাইব?"

পুত্রবধূরা কন্যাগণ অপেক্ষাও তাঁহার অধিক প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজে থাকিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বিবাহ হয়। পুত্রবধূর শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে বাক্যালাপ না করা পূর্ব্ববঙ্গের এক চিরাগত কুপ্রথা। গুপ্ত মহাশয়ের নিকট এই প্রথা প্রশ্রয় পায় নাই। তিনি একাদশ বর্ষীয়া বালিকা পুত্রবধূ প্রসন্নতারাকে গৃহে আনিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি আমার মা, সুতরাং সন্তানের সহিত কথা বলিতে আপত্তি করিও না। যে যাহাই বলুক, তুমি তাহাতে কিছু মনে করিও না। লোকে আর কয়দিন মন্দ বলিবে? যখন দেখিবে ইহাতে দোষের কিছু নাই তখন আপনা হইতে চুপ করিবে।" তিনি যখন আনন্দ মনে বধূমাতাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন, গ্রামের কত লোক তামাসা দেখিতে আসিয়া

"নির্লজ্জ বৌ" বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। কিন্তু স্বাধীনচিত্ত বালিকা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দমনে শ্বশুরের আজ্ঞাপালন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিতেন। এইরূপে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বধূ শ্বশুরের অসীম স্নেহ মমতা এবং অপর্য্যাপ্ত আদর যত্ন পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গুপ্ত মহাশয় মাতৃবিয়োগের পর এই বধূকে লিখিয়াছিলেন, "মা গো, তুমি বর্ত্তমানে আমি ত প্রকৃতপক্ষে মাতৃহারা হইতে পারি না।"

তাঁহার পুত্রবধূগণ সকলে যখন তাঁহার গৃহে একত্র হইতেন, তখন তিনি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে দিন কাটাইতেন। বলিতেন "ইহারা যখন ঘরে চলা ফিরা করে তখন ঘরের কি না শোভা হয়!" কখনও আহারে বসিয়া ব্যঞ্জনের আকার দেখিয়া আদর করিয়া বলিতেন "কে গো আজ রাঁধিয়াছে? মেজ বৌমা বুঝি? নয় ত আর কারো হাতে এমন হয় না।" ছোট বৌমাকে হয়ত জলযোগের আয়োজন করিতে দেখিয়া কাছে গিয়া হাত পাতিয়া বলিয়াছেন, "দে ত মা, কেমন হয়েছে দেখি।" কোন ঘরে গিয়া সুশৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন "আমার ছোট বৌমার হাত না হইলে এমন পরিপাটি আর কেহ করিতে জানে না।" পরিবারের সকলের প্রতি ছোটবধূর সমান ব্যবহার দেখিয়া পত্নীর মৃত্যুর পরে ইহাকে বলিয়াছিলেন "মা গো, তোমার প্রতি সকলের ভার পড়িল; তুমি সব দেখিয়া শুনিয়া যখন যা আবশ্যক করিবে, আমার নূতন বৌমার মুখের দিকে তুমিই চাহিবে, নয়ত আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইবে না।" সংসারের কোন কাজ ছোট বৌমার পরামর্শ না লইয়া করিতেন না। আর ইনিও শ্বশুরের সেবাতেই যেন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আরামে ব্যারামে ইনিই সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া সেবা যত্ন করিতেন। যখন পুত্র-

বধূগণ স্বামীসহ বিদেশে থাকিতেন তখন পারতপক্ষে তাঁহাদের সুখ সুবিধার বিঘ্ন ঘটাইয়া আপনার অসুস্থতায় পরিচর্য্যা করিতে তাঁহাদিগকে ডাকিতেন না। কিন্তু ছোট বৌমা যেখানেই কেন না থাকুন ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া আপনার অশেষ কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া দিবা নিশি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া কন্যাগণের উপস্থিতি সত্বেও "আদরের ভাল মা" (ছোট বৌমা) না হইলে আর কাহারও হাতে ঔষধ পথ্য গ্রহণ করিতেন না। যখন শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, চক্ষু মেলিবারও শক্তি ছিল না, তখন পথ্যাদি মুখের কাছে ধরিলে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিতেন "কে ? ভাল মা আনিয়াছ ? তবে দেও।"

পুত্রশোকে তাঁহাকে কাতর করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার মধ্যমা বধূমাতা বৈধব্য-বেশে তাঁহার সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতেন তখন কেবল ঘন ঘন ওঁ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিয়া অন্তরের আকুল আবেগ সম্বরণ করিতেন। স্বামীশোকে তাঁহার অসম্ভব ধৈর্য্য দেখিয়া কত সময় বলিয়াছেন "দয়াল ব্রহ্ম ইঁহার মনে এমন বুঝ আনিয়া না দিলে আজ আমার দশা কি হইত ? সর্ব্বদা হা হতোস্মি করিলে আমি কি ঠিক থাকিতে পারিতাম ?" তিনি সর্ব্বদা কাছে বসাইয়া ধর্ম্মালোচনায় ইঁহার মনে সান্ত্বনা দিতেন। দূরে গেলে সর্ব্বদা পত্রাদি-দ্বারা ইহপরলোকতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেন। পুত্রবধূ যে পুত্র হইতেও প্রিয় হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।" *

তিনি পুত্রগণের উপযুক্ত শিক্ষাদানে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারাও প্রায় সকলেই সুশিক্ষা লাভ করিয়া সংসারে গণ্যমান্য ও উপার্জ্জনশীল হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ-সরকারের

* পিতৃস্মৃতি।

অতিশয় সম্মানের পদ পাইয়াছেন দেখিয়া কত লোক বলিত "ধন্ত বাপের ছেলে, এমন ছেলে যাঁর তাঁর আর ভাবনা কি?" পিতা তখন করযোড়ে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিতেন "সকলই সেই মঙ্গলময়ের মরজি, তিনি কাকে দিয়া কি করেন তা তিনিই জানেন।"

অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া কখনও ইঁহাদের কর্ম্মস্থানে গেলে, পাছে লোক সসম্ভ্রমে তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করে সেই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেন "কি অমায়িক পুরুষ! তেমন বাপ হইলে হয়ত অহঙ্কারে মাটিতেই পা দিতেন না। আর ইনি এমনই মাটির মানুষ যে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না ইনিই এসকল সম্মানী পুত্রের পিতা।"

তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে না পারিয়া পাছে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া কার্য্য দিতে বাধ্য হন, সেজন্য তিনি পুত্রদিগকে কখনও কাহারও কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিতে অনুরোধপত্র লিখিতেন না। সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার এইরূপ সুবিবেচনা দেখিয়া পুত্রেরা তাঁহাতে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সন্তানদের সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাকে আনন্দিত করিত, কিন্তু কখনও অহঙ্কারী করিত না। তিনি ধন-সম্পদে বাস করিয়া কখনও তাহার বাধ্য হন নাই।"

সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মিষ্ট স্বভাবে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন। এ নিমিত্ত তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত সমাগত বন্ধুজনকে তিনি কি সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন তাহা এক শিক্ষণীয় দৃশ্য ছিল। নগ্নপদে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত মানী লোকের এহেন বিনয় দেখিয়া বন্ধুজন মুগ্ধ হইয়া কেহ আলিঙ্গনে, কেহ পদধূলি গ্রহণে তাঁহাকে পরম আপ্যায়িত করিতেন। কি

বিবাহ-উৎসবে কি শ্রাদ্ধবাসরে কি আন্ডকার্য্যে কি বা মৃত্যুশয্যায় তিনি সকলেরই বিপদে বন্ধু এবং সম্পদে সহায় হইয়া জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

"বেতনভোগী ভৃত্যাদিগকে তিনি আপন পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। তাই তাহারা তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অনুগত ও বশীভূত হইয়া পড়িত। পারিবারিক কোন ক্রিয়াকর্ম্মে আগে ইহাদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন দেখিয়া যদি কেহ বলিত "রায় মহাশয়ের এ কি উল্টা রীতি ?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন "জান না কি পেটে খেলে পিঠে সয় ? আগে এদের পেট ভরিয়া খাওয়াও, তার পর যত খুসী খাটাও। গরীব বলিয়া কি ইহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা কম ? তোমরা এর পরে দশবার কেন না খাও। কিন্তু এরা একবার কাজের ভিড়ে পড়িলে কে মনে করিয়া খাওয়ায় বল ?"

কত সময় ইহাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতেন "তোদের যার যা লাগে চাহিয়া নিস্, উনা পেটে উঠিস্ না যেন।" কর্ত্তার মুখের এই মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে যে পরিমাণে কর্ম্মোৎসাহী করিয়া দিত শাসনের শক্ত কথায় তাহা কখনও হইতে পারে না।

গৃহের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে ভৃত্যদের কিছু অংশ থাকিত। বলিতেন, "দিও কিঞ্চিৎ না করিও বঞ্চিত।" কচিৎ কখনও কোন সামগ্রীর অকুলন হইলে যদি ইহাদিগকে না দেওয়া হইত তবে তিনি বড় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেন "এরা খাটিবে আমার ঘরে খাবে গিয়া কার দুয়ারে ?"

দরিদ্রের ভোজনব্যাপারে কখনও সস্তাদরে দ্রব্য আনিতে দিতেন না। ইহাতে যদি কেহ বলিত "দীন দুঃখীর আবার দামী দই সন্দেশের দরকার কি ?" তিনি হাসিয়া বলিতেন "জিহ্বা বুঝি কেবল তোমার আমারই আছে, এরা কি আর ভাল জিনিসের তার বোঝে ?"

একবার কোন উৎসবে নিমন্ত্রিত সকলে আহারান্তে উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট মিঠাই মোণ্ডা সংগ্রহ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এসব আমার চাকরকে দেবে নাকি ?" সে ব্যক্তি উত্তরে বলিল "বাছিয়া বাছিয়া ভাল দেখিয়া তুলিতেছি। পাতে দিলে কেহ টের পাইবে না।" শুনিয়া তিনি বলিলেন "খবরদার অমন কাজ করিও না। আপত্তি জানিয়া অজানিত ভাবে এদের এসব খাওয়াইয়া তোমার কি লাভ তা ত বুঝি না। অকুলান হইয়া থাকিলে আমাকে বলিলেই আনাইয়া দিতে পারি। পাতকুড়ান খাবার লোক ত ঢের আছে। যারা এ সব পাইলে খুসী হয় তাদেরে ডাকিয়া দাও না ?"

সামান্য লোকদের প্রতি তাঁহার এই সদ্বিচার দেখিয়া যে ব্যক্তি এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মনে মনে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ ছোট কথায় ছোট কাজে সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এই সহজ ধর্ম্ম শিক্ষায় তাঁহার কত দাস দাসী প্রজাবর্গ পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। নতুবা বিদ্যাবুদ্ধিহীন সাধারণ লোকের ভিতর ধর্ম্মপ্রচার করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় বিধর্ম্মী বলিয়া যাহারা আপন আপন পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদের কিছু কিছু সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। আপনার চেষ্টা উদ্যোগে ইহাদের কোন কোন সন্তানের উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়া লোকের গঞ্জনা হইতে ইহাদিগকে কিছু পরিমাণে নিষ্কৃতিও দিয়াছেন। তাই তিনি দাস-দাসী ও প্রজাবর্গের শুধু মনিব না হইয়া তাহাদের এক মুরুব্বি ছিলেন। *

* পিতৃস্মৃতি।

নাতি নাতিনীদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি মিষ্ট ছিল। তাহারা কখনও তাঁহার সঙ্গে খেলিত, কখনও হাস্য কৌতুকে মত্ত হইত। "একবার শিশুর দল দাদা মহাশয়কে গোলাম-চোর বানাইতে ইচ্ছা করিয়া গোলামখানা তাঁহার হাতে দিল, এবং বলিল 'এখন ঠাকুর দাদার সঙ্গে যে কথা বলিবে তাহাকেই তিনি গোলাম ফেলিয়া দিবেন, খবরদার কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলো না যেন।' তিনি নিরুপায় হইয়া অবশেষে একটি গল্প আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুক্ষণ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন। তখন শিশুর দল সতর্কতা ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, 'তারপর, দাদা মহাশয়?' তিনি অমনি গোলামখানা ফেলিয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া হাত-তালি দিতে লাগিলেন।"

একদিন তাঁহার দূর সম্পর্কীয় এক নাতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যারে কালাচাঁদ, (তার রংটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া আদর করিয়া এই নাম রাখিয়াছিলেন) তুই পায়ে জুতা না দিয়া ফুটবল খেলিস কেন? বালক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "ঠাকুর দাদা, বুড়া হইলে বুঝি লোকে এমনই আঁধা হয়। এত বড় কাল জুতাটাও দেখতে পাও না?" তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তা না বল্লে কে টের পায়, দাদা? তোর পায়ের রং এর সঙ্গে কাল জুতা একেবারে মিশে যায়, আমার চক্ষের দোষ দিলে কি হবে ভাই?" তাঁহার কোন পৌত্রীর বিবাহের দিনে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন 'দিদি তুমিত চস্‌মা পর, আর তুমি আজ যাকে বর বলিয়া গ্রহণ করবে সেওত চস্‌মাধারী দেখ্‌তে পাই; আচ্ছা, তবে তোমাদের বিবাহপদ্ধতিতে কেন আর একটি প্রতিজ্ঞা যোড়া দিয়া লও না যে, 'তোমার চস্‌মা আমার হউক, আমার চস্‌মা

তোমার হউক এবং আমাদের উভয়ের চস্‌মা ঠাকুরদাদার হউক'। তা হ'লেত বেশ হয়, কেমন ?"

"আর একদিন তিনি বন্ধুবান্ধব লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় বেগুন ভাজা পাতে পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, 'বাইগুণগুলির বড় বীচি দেখি।' অমনি একজন তাঁহাকে সংশোধন করিয়া বলিলেন, "রায় মহাশয়ের আর বাজাল কথা গেল না। বেগুণ বলিলে যত মিষ্ট শুনায় বাইগুণ বলিলে কি তা হয় ?" তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন 'যদি মিষ্টি শোনানই উদ্দেশ্য, তবে বেগুণ কেন ? প্রাণনাথ বলিলেই আরোও মিষ্টি শোনায়।" *

তিনি অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। একদিন কাওরাদির কাছারীতে সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণকে রন্ধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি অন্য স্থান হইতে আহার করিয়া আসিয়াছিল বলিয়া কিছুতেই রন্ধন ও আহার করিতে সম্মত হইল না, কেবল শুইয়া থাকিবে বলিল। তখন গুপ্ত মহাশয় বাক্স হইতে একটি পরিপাকের বড়ি এবং মধু বাহির করিয়া বলিলেন "ইহা সেবন করুন। যদি পরিপাক হয় আহার করিবেন, নতুবা ইহাদ্বারাই আতিথ্য হইল।" তাঁহার রসিকতা দেখিয়া উপস্থিত সকলের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়াছিল।

এইরূপ সর্ব্বদা কোন না কোন আমোদ তুলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। আবার আমোদ করিতে করিতেই ওঁব্রহ্ম নাম করিয়া সামান্য ব্যাপারকে গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেন।

এমন আমোদপ্রিয় ছিলেন যে যখন হাসাইতে আরম্ভ করিতেন পেটে ব্যথা ধরিত। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ডাক্তার

---

* পিতৃস্মৃতি।

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের গৃহে একবার জামাতাদের নিমন্ত্রণ করিয়া এমন আনন্দের আয়োজন করেন যে, উহা তাঁহাদের স্মরণীয় হইয়া আছে। একদিন নাতি-নাতিনীদেরে লইয়া আনন্দ করিতে করিতে ভাবে আত্মহারা হইয়া "আনন্দে আনন্দময়ে, নিরানন্দ নাই এ ঘরে" গান রচনা করিলেন। ক্ষুদ্র ব্যাপারকে এইরূপ ধর্ম্মের ব্যাপারে পরিণত করিতেন।

গৃহে প্রতিদিন সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে একত্র ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কখনও বা গৃহের সকলকে সমবেত করিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিবারে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। পতিপত্নী মিলিয়া যখন ভগবৎবন্দনা করিতেন তখন বড় সুন্দর দৃশ্য প্রকটিত হইত। পত্নীর পরামর্শ ভিন্ন তিনি প্রায় কোন কার্য্য করিতেন না। দৈবাৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ অভিমানে পত্নীর মন ভারাক্রান্ত হইলে, কালীনারায়ণ তাহা উপহাসে উড়াইয়া দিয়া দাম্পত্য প্রণয়ের বিচিত্রতা উপভোগ করিতেন।

একবার একখানি বসতবাটী খরিদ করিতে মনস্থ করিয়া পত্নীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু পত্নীর নিকট সম্মতি পাইলেন না। কারণ, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছিল। আর এক ঋণ শোধ না হইতে পুনরায় ঋণ করা পত্নীর নিকট সমীচীন বোধ হয় নাই। এদিকে কালীনারায়ণ মনে করিলেন ভগবানের ইচ্ছায় এ ঋণ বেশী দিন থাকিবে না, কিন্তু এমন পছন্দসই বাড়ী আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং ইতস্ততঃ না করা উচিত মনে করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গৃহিণী এখন বিরক্ত হইলেও যখন নিজের বাড়ীর সুখ সুবিধা ভোগ করিবেন, তখন আর এ রাগ থাকিবে না। যে দিন বাড়ী

খরিদের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া আসিলেন সে দিন আর পত্নীকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু পত্নীর কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একজন বলিল "রায় মহাশয়, দেখেন কি? বাড়ী খরিদ করায় ঠাকুরাণী বড় চটিয়াছেন।" কালীনারায়ণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "কাজির কাছে জিজ্ঞাসা করিলে ত দুর্গোৎসবই মানা।" ইহার পর ২।৩ দিন পত্নীর মুখ ভার ছিল। এইরূপে সময় সময় ধার্ম্মিক পিতামাতার কৃত্রিম কলহ দেখিয়া বয়স্ক পুত্র-কন্যাগণ বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতেন।

অন্নদা দেবী রন্ধনে সিদ্ধহস্তা ছিলেন। বালিকা বয়স হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বদা স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছেন। কন্যারা উপযুক্তা হইলে যদিও তাঁহার এ পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল, তথাপি সময় সময় তাঁহার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন না হইলে কাহারও পরিতৃপ্তি হইত না। ক্রমে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িল, এবং কন্যারাও বিবাহান্তে স্বামী-গৃহে চলিয়া গেলেন। তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে পাচক ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে গৃহিণীকে রন্ধনে প্রবৃত্তা দেখিয়া তিনি আমোদ করিয়া বলিতেন "বুড়া বয়সেও আমার কপালে ভাল খাওয়ার সুখ লেখা আছে, কাজেই ভাল রান্নাটা একেবারে বাদ গেলে চল্‌বে কেন?"

অন্নদা দেবী যদিও ভাল লেখা পড়া জানিতেন না, তবু উজ্জ্বল ধর্ম্মবুদ্ধির জন্য কত সুন্দর ও সারগর্ভ কথায় ও গানে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার রচিত কতিপয় সুন্দর গীত ভাবসঙ্গীতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি অতি মিষ্ট ছিল। এই মিষ্ট প্রকৃতি

লইয়া তিনি ধার্ম্মিক পতির সঙ্গে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কালীনারায়ণও পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত অনুরাগে পূর্ণ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পত্নীর পরিত্যক্ত শয্যা ব্যবহার করিয়া স্বামী-ধর্ম্মের মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জনসমাজে স্বামীভক্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু কালী-নারায়ণ আপনার প্রণয়িণীকে স্নেহ, মমতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং কোমলতার আধার জানিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনদ্বারা দাম্পত্য জীবন চরিতার্থ এবং স্ত্রীকে যথার্থ সম্মান করিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। "যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।" এই বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছে।

অতএব আমরা বলিতে পারি কালীনারায়ণ পারিবারিক জীবনে একটি আনন্দপূর্ণ, সুখময়, প্রেমিক, সহৃদয় মানুষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছেন। এমন মানুষের দেহধারণ সার্থক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভাব-সঙ্গীত ও ভাব-কথা।

গুপ্তমহাশয় ভাবরাজ্যের সাধক ছিলেন। অভাবের ক্রন্দন তাঁহাতে ছিল না। "জীবনের সকল ঘটনায় আপনাকে না দেখিয়া ব্রহ্মকে দেখা ও তাঁহার মহিমা চিন্তা করা ইহাই তাঁহার সাধনা। 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' বলিয়া চীৎকার না করিয়া অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের

স্বরূপচিন্তায় নিযুক্ত হওয়া পাপমোচনের প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই তাঁহার উপদেশ। যাঁহারা সংসারের অনিত্যতা, দেহের নশ্বরতা, এবং পরকাল ও নরক যাতনার ভীষণতা শুনাইয়া মানুষকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতে চাহেন তাঁহাদের মতে এই সংসার মোহময়, স্ত্রীপুত্র মায়ার খেলা, রূপরস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দময় এই বিচিত্র শোভাময়ী বসুন্ধরা মানুষের প্রলোভনের স্থল। সুতরাং এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া পরম সত্যের দিকে গমন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু গুপ্তমহাশয়ের মতে সংসার মধুময়, আনন্দময়, কেননা আনন্দময় পরব্রহ্ম সকলের ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছেন।

"জগৎ মঙ্গলে গড়া,
জগৎ মঙ্গলে ভরা,
অমঙ্গল নাই কিছুর মাঝে,
মৃত্যু কি জরা,
সদা চরাচরে ঘরে ঘরে
মঙ্গলে মঙ্গল বিলায়।"

অতএব ঈশ্বরের দয়া, আনন্দ, সৌন্দর্য্য এবং লীলার কথা নিয়ত শ্রবণ করিবে। তিনি আছেন, অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যরূপে বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া আছেন, এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করিবে। ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন, স্মরণ এবং আত্মার আত্মারূপে পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা ইহা সম্ভবপর হইবে।

গুপ্তমহাশয় শিবসুন্দরের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণের প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। মলিন বস্ত্র ব্যবহার করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। যেখানে থাকিতেন বাড়ী ঘর সুন্দর পরিপাটি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার মনোনীত

কাওরাদি স্থানটি সুন্দর, তাঁহার নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরটি অতি সুন্দর। তাঁহার বাসস্থান কাছারী ঘরখানিও অতি পরিপাটি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভগবানকে যাঁহারা সুন্দররূপে দর্শন করেন, শিব-সুন্দরের অপরূপভাতি দর্শন যাঁরা করেন, তাঁহারা আপনাকে কুরূপ করিয়া রাখিতে পারেন না। আমি কুৎসিৎ হইয়া থাকিলে ভগবানের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে বাধা পড়িবে ভাবিয়া তাঁহারা পাপ তাপকে দূর করিয়া হৃদয় মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন।"

গুপ্তমহাশয় প্রেমিক সাধক ছিলেন। মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য এবং আশ্রিত জনের প্রতি করুণায় তাঁহার এই প্রেম-সাধনার প্রকৃত পরিচয়। ব্রহ্মকৃপায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পুরুষকার-বলে ভক্ত হইব, সাধক হইব এমন ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ সকলই ব্রহ্মের করুণা, তাঁহার করুণাধারা নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। এই করুণা দর্শনে পুরুষকারের খর্ব্ব হয়, অহংভাবের অবসান হয়, ভক্তির বিমল রশ্মিতে হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। গুপ্তমহাশয় স্বীয় জীবনে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিয়াছেন।

তাঁহার সাধনলব্ধ তত্ত্ব, তাঁহার রচিত ভাবসঙ্গীত, ভাবকথা, ও উক্তিতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতগুলির ভাবসঙ্গীত নামকরণের হেতু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"না থাকার নাম অভাব, থাকার নাম ভাব। থাকার ভাবই ভাবসঙ্গীতের ভাব। এই ভাবে ইহার ভাবসঙ্গীত নাম হইল।"

"ভাবসঙ্গীত গুপ্ত মহাশয়ের অতুল সম্পত্তি। এই সম্পত্তি তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতা পরব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা

কেবল তাঁহার সম্পত্তি নহে, বঙ্গসাহিত্য এই সম্পত্তি পাইয়া লাভবান হইয়াছে। গুপ্তমহাশয় সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা পূর্ব্ববঙ্গের প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাটিয়াল গান পূর্ব্ববাঙ্গালার নিজস্ব ধন। কৃষকগণ দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া যখন নৌকা বাহিয়া গৃহাভিমুখে গমন করে তখন উৎসাহের সহিত তালে তালে বৈঠা বাহিয়া ভাটিয়াল গান গায়। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতেছে, তাহার ম্লান কিরণ জলমগ্নপ্রায় শস্যশীর্ষে পতিত হইয়া স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উপরে সচলমেঘভরা বর্ষার আকাশ, নীচে নীলবসনে আবৃতা বসুন্ধরা। এ সময়ে ভাটিয়াল স্বীয় মোহন মূর্ত্তিতে কৃষক মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে। নৌকাবাহী কৃষকগণের মুখে যাঁহারা ভাটিয়াল গান শুনিয়াছেন তাঁহারা সেই স্বর, সেই গ্রাম্য ভাষার পদ, ও গায়ক-গণের উচ্ছ্বাস কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সেই দূরশ্রুত গ্রাম্য সঙ্গীত শ্রোতার মনকে ভাবাবেশে মুগ্ধ করিয়া থাকে। গুপ্ত মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতের অধিকাংশগুলি সেই ভাটিয়াল সুরে। গ্রাম্য সুরে ও ভাষায় রচিত হওয়ায় ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।"*

ভাবসঙ্গীত ভাব ও রসের উৎস। যাঁহারা কোন দিন উহা রচয়িতার মুখে একবার শুনিয়াছেন তাঁহারা এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। তাঁহার অনুযাত্রী কি তাঁহার সঙ্গীতানুরাগিণী কন্যাগণের মুখে শুনিয়াও শ্রোতারা মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। উহা এমনই সরস যে শুনিলে প্রাণ জুড়ায়।

ভাবসঙ্গীতের যথার্থ সমাদর ভক্ত ও সাধকমণ্ডলীতে। উহাতে

* নব্যভারত ১৩২৩, আষাঢ় ৺কালীচন্দ্র ঘোষাল লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

রচয়িতার ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য, সেবার যে চিত্র আছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

তাঁহার জীবদ্দশায় কত ভাবুক মহাত্মার সঙ্গে এই সূত্রে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মমণ্ডলী, প্রজাবর্গ, এবং নানা দেশীয় বন্ধুগণের সহিত ভাবসঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া তিনি কত সুখী হইতেন, কত প্রেমরঞ্জিত হইতেন, তাহা অনেকেই জানেন।

এক প্রকার ভাবুকতা মত্ততার নামান্তর। উহা রোদন, হা হতোহস্মির উচ্ছ্বাস তুলিয়া প্রথমে সাধককে অধীর করে, পরে শুষ্কতার মধ্যে ফেলিয়া ধর্ম্মহীনতায় উপনীত করে। ভক্ত কালী-নারায়ণ এ প্রকার ভাবুকতার বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন সাগরের ন্যায় গভীর ও শান্ত ভাবের সাধক। "অভাবে পায় কে তাঁরে" এই সঙ্গীতে তিনি তাঁহার ভাব সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির আলোচনা করিলে তিনি কিরূপ জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেন তাহার উপলব্ধি হয়।

সঙ্গীতরচনার তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন যে ভাবের উদয় হইত তখনই তাহা সঙ্গীতাকারে ব্যক্ত করিতেন। পথে চলিতেছেন কি কোন নূতন দৃশ্যে মনে ভাবের উদয় হইয়াছে, অমনি তদুপযোগী গান রচনা করিয়াছেন। একবার নৌকায় ভাটপাড়া যাইতেছিলেন। পথে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য্যদর্শনে মোহিত হইয়া রচনা করিলেন "(এগো) মরি আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায়।" এই সঙ্গীতে তাঁহার হৃদয়ের গভীর বৈরাগ্য ও অনুরাগ ব্যক্ত হইয়াছে।

"যেমন ভাটি সোতে ভাটায় গড়ান, সাগর যেমন সদা গো টানে

নদীর পরাণ, সে টান এতই সরল, মনের গো গরল অমৃত হইয়া যায়।

সে যে কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা, উড়ায়ে দেয় মনের পাখী, মানা মানে না। পাখী উড়ে যায় বিমানের পথে, শীতল বাতাস লাগে গায়।"

যাঁহারা কোন দিন পাখী পুষিয়াছেন এবং বনের পাখীর মন্ত্রণায় খাঁচার পাখীকে পলায়ন করিয়া বিমানে উড়িতে দেখিয়াছেন তাঁহারা শেষোক্ত চরণের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। আত্মার কর্ণে পরমাত্মার মন্ত্রণা দেওয়ার কথাই সাধক এস্থলে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বিকৃত বৈরাগ্যের অনুমোদন তাঁহার নিকট ছিল না। একস্থ লিখিয়াছেন ;—

"এ গো এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়, যে উদাসে সংসার গো ছেড়ে বাইরে লয়ে যায় ; এ যে সংসার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর সংসার ছু'য়ে এক ক'রে ফেলায়।"

নিয়ত বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র, সংসারই ধর্ম্মের নিকেতন, জীবনে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিবে, ইহা কেবল উপদেশে নয়, জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের লোক সময় সময় পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে অবজ্ঞার 'বাঙ্গাল' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। ভক্ত কালীনারায়ণ সেই অবজ্ঞার বিশেষণটি কেমন দীনতায় ভূষণ করিয়াছেন ;—"বাঙ্গাল কালীর মুখে দিয়ে চুণ কালী, সে উদাসে প্রাণ সজনী যা তোরা চলি, মোরে সঙ্গে করি লয়ে যা গো দরদি, তোদের ধরি পায়।"

তিনি তাঁহার রচিত ভাবসঙ্গীত বোধন, স্বরূপ, মহিমা, স্তুতি, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা, নাম, প্রেম, বিচ্ছেদ প্রভৃতি সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক বিভাগের নামে সেই সেই ভাবের সূচনা হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ (ক) "ব্রহ্ম সত্য নিরাকার, এই সৎই স্থিরাকার, আকার বিকার নাই, তাঁহাতে চিদ্ঘন ব্যাপার; এই চিৎরূপে চিৎ চেতায়, যাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম পায়।"

(খ) "তুমি সুন্দর অতি সুন্দর, তুমি সুন্দরের খনি, পরশে তোমার হই হে সুন্দর পরশি পরশমণি।"

(গ) "মরি দেখ্‌লে সে রূপ আর কি ভুলা যায়, ভুলি ভুলি ভুল্‌তে নারি শয়নে স্বপনে জাগায়।

হায়, নয়নজলে নয়ন অন্ধপ্রায়, দেখি দেখি আর দেখি না, জলে ভরে যায়, সে জল ঝর ঝর ক'রে হৃদে পড়ে, কি [illegible] ঝড়ি হ'তে যায়।"

তাঁহার রচিত "ওহে জগদীশ তুমি এক তুরিতে কি না করতে পার" গানে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তার সুন্দর বর্ণনা আছে। ব্রহ্মের কৃপার মহিমা "বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সঙ্গীতে সুন্দর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গীতটি ১৮৮৯ সনে কাওরাদি মাঘোৎসবে রচনা করেন। তদবধি উহা ব্রাহ্মগণের প্রিয় সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া আসিতেছে। উৎসবাদির সময় ইহার মহা নিনাদে ব্রাহ্মগণের হৃদয় আলোড়িত হইয়া থাকে।

বন্ধ্যানারীর পুত্রস্নেহের বর্ণনা যেমন কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না, তেমনি সাধনভজনহীন রচয়িতার সুললিত শব্দযোজনাপ্রধান সঙ্গীতে ভক্তির কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কালীনারায়ণের রচিত

গীতগুলি ভক্তির অমৃতধারায় পরিপূরিত। কারণ, তাঁহার হৃদয়ের ভাবই সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে।

জগতের এবং জীবনের সম্পর্কে ব্রহ্মের নৈকট্য নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে;—

"প্রাণনাথ, তুমি আমার নবীন পরাণ, (আমার) সকল নবীন পুরাণ হ'ল, তুমি না হ'লে পুরাণ! কত এল কত গেল, কে বা না হ'ল পুরাণ (প্রাণ রে), তুমি আমার নিত্য নূতন, চিত্তে আছ বর্ত্তমান।

"হয়েছে হতেছে কত, দুইখান মুখ নাই এক সমান, কেমন নবীন ছন্দ, নবীন বন্দ, পছন্দ নবীন ধরান।

কালীর চক্ষে জালি ব'লে তুমি কি হবে পুরাণ? (প্রাণ রে) জালির বন্ধে তুমি বন্ধ, অন্ধেও না যায় বুঝান।"

স্বাভাবিক ভাবে আত্মা ও পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধের পরিচয়;— (ক) "তুমি আমার কেমন 'আমি', আর কিসে দেখাব আমি, দেহের যেমন 'আমি' আমি, তুমি আমার তাই।" (খ) "প্রাণ রে সুখ নাই, তুমি বিনা আর সুখ নাই, তুমি বিনা দুঃখে ভরা সুখেরি সংসার"।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিনামের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। ভক্ত কালীনারায়ণের রচিত ভাবসঙ্গীতে ব্রহ্মনামের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

শোকে দুঃখে, ব্যাধি জরাতে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া তিনি শান্তি লাভ করিতেন। তাঁহার রচিত "ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই" সঙ্গীত কত ব্যাধিপীড়িত, মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত নরনারীকে শান্তিদান করিতেছে। "নামে পরাণ জুড়াইবে দুঃখ তাপ ফুরাইবে" ইহা কথার কথা নহে। ইহার সাক্ষ্য তাঁহার জীবনে এবং যাঁহারা তাঁহার কণ্ঠে এই মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

(১) "ওঁব্রহ্ম ওঁব্রহ্ম ওঁব্রহ্ম ওঁ হে, ওঁব্রহ্ম প্রাণে প্রাণে প্রেম-যজ্ঞের হোম হে"। (২) "ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুব দিয়ে মন থাক্ রে"। (৩) "এমন ব্রহ্মনাম-সুধা সদা রে ও মন পান কর"। (৪) "ব্রহ্ম-নামের রসের ধারা" (৫) "শুধু ব্রহ্মনাম এই সার রহিবে, আর যাবে সকল।" (৬) "ব্রহ্মনামামৃত পান কর" (৭) "ব্রহ্মনাম, কি মধুর রে ভাই" প্রভৃতি গীতগুলিতে নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণ শ্বাস প্রশ্বাসে নাম লইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গুপ্ত মহাশয় নামগুণ কীর্ত্তনে বৈষ্ণব ভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মানব জীবনকে ক্ষুদ্র একটি ভেলার সঙ্গে তুলনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"ব্রহ্মপ্রেম-সাগরের জলে জীবন-ভেলা ভাস্‌বি কবে রে! সাগর-জলে জাহাজ চলে রে, জাহাজ ঝড় তুফানে ডোবে, সেই তরঙ্গে কে দেখেছে রে, কলার ভেলা ডুবে কবে রে? চল্‌তে চল্‌তে যখন ভেলা রে, পাটে পাটে খসে যায়, কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে, সাগরসঙ্গ লাগায় গায় রে"।

এই সঙ্গীতে সাধকজীবনের গভীর প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। আলোর পাশে অন্ধকারের ন্যায় সাধকজীবনে মিলনের পাশে বিচ্ছেদের তীব্র দহন। প্রেমিককে বিচ্ছেদ-অনলে দগ্ধ করিয়া ভগবান প্রেমের পরীক্ষা করেন। এইরূপে প্রেম নির্ম্মল হয়, স্থায়ী হয়। ভক্তজীবনের বিচ্ছেদের চিত্র নিম্ন লিখিত সঙ্গীতে উজ্জ্বল হইয়াছে; (১) "বাঁচি না বাঁচি না আর তোমা বিহনে। জলে তুষের আগুন দিবানিশি।" (২) "যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে শূন্য গো দেখি, র'য়ে র'য়ে ঝরে গো আঁখি, দেখে কিছু দেখি না।"

ভাবসঙ্গীতে উৎসব, প্রচার, দেহতত্ত্ব, বৈরাগ্য, ইত্যাদি নানা ভাবের সঙ্গীত আছে। বিবিধ ভাবাত্মক সঙ্গীতে ইহা অমৃত-ভাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

কোন সময় এক বেদান্তবাগীশ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক আরম্ভ করেন। তিনি এই অভিমানী পণ্ডিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "হে পণ্ডিত, পণ্ডিত হ'য়ে, পণ্ড ক'রে কি সুসার আছে বল না? অসত্যে সত্য ভূষণ দিলে কখনো কাকের ছা ময়ূর হবে না।" এই গীত রচনা করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া "ধন্য মা ভারতেশ্বরী তোমার গুণে যাই মা বলিহারী" গান রচনা করেন। ১২৯৬ সনে চৈত্রমাসে জন্মভূমি আকানগর গিয়া জন্ম-ভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া "প্রণমি মা গো জন্মভূমি আমার ব্রহ্মরূপের স্বরূপ তুমি" রচনা করেন। এই গীতের শেষ চরণে আছে "তোমার মাধব ধবল নই মা, কালী মেখে কালী আমি, আমার সেই কালী মা ধুয়ে দে মা, আর কারে কই বিনে তুমি!"

গীতরচনায় তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল। "আজ বালিকা-বিদ্যালয়ে পুরস্কারবিতরণ, যাও রায় মহাশয়কে গানের জন্য ধর গে, আজ অমুকের বিবাহ রায় মহাশয়কে গানের ভার দেও গে। আজ দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে কে আর এমন সুললিত গানে কৃপণের ধনে অন্নসত্র খোলাইয়া দিবে? খ্যাতনামা রমাবাই সরস্বতী পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করিলেন, আর দেখ রায় মহাশয় কেমন তাঁর অভ্যর্থনার গান রচনা করিলেন—"রমা সরস্বতী, গুণে গুণবতী, ভারত নারিজাতি-গৌরব গো।" আপনার পরিবারে জাতকর্ম্ম নামকরণ বা কন্যাগণের বিবাহোপলক্ষে অবকাশ মতে আপনিই গান

বাঁধিয়া দিতেন। সে সকল গান যদিও তিনি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা আবশ্যক মনে করেন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে তাহাদের ভাবের মাধুর্য্য ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। একটি গানে আছে; "আহা মরি মরি কি বা মনোহর, শশী চপলার মিলন সুন্দর, শশীর শীতল কিরণের জালে, মিশি হাসি হাসি চপলা বিজলে, কে দেখেছে কোথা বিনা মেঘজালে খেলিছে চপলা পেয়ে হিমকর"। *

২। ভাব-কথা।

ভাবসঙ্গীতের সঙ্গে ভাব-কথা মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"এক ঈশ্বর এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিত্য নিয়মে এই সংসার, ইহকাল, পরকাল সকল চলিতেছে। সেই সৃষ্টির মধ্যে আমি একজন. এই কথা সকলেই বিশ্বাস করে; অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয় লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। (ফলে এ কথা লইয়া কেহ কোন কথা বলে না, বা বলিতে পারে না। কেননা যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহাতেই কথা উঠে।) তাই ঈশ্বর কি ভাবে আছেন, তাহার ভাব লইয়া সংসারে সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং তাহাই লোকের আলোচনার বিষয়। অতএব সে বিষয় সম্বন্ধে আমি যে-সকল ভাব লাভ করিয়াছি. তাহাই সকলকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন;—

টানই প্রাণ।

যেমন সাগরের টান আছে বলিয়া নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদিতে স্রোত প্রবাহিত হয়, (যাহা না থাকিলে মরা নদী বলা

* শিশুস্মৃতি।

হইয়া থাকে) তেমন আমরা সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে পারি, এ বিষয়ে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা থাকাতেই আমরা তাঁকে জানি ও প্রাপ্ত হই। ইহারই নাম ব্রহ্মটান। এই টানই আমাদের প্রাণ। কেননা এই টানেই জ্ঞান পাইয়াছি। ইহারই প্রসাদে আমরা পশুমধ্যে গণ্য না হইয়া মানুষ হইতেছি। অতএব যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হইতেছে, তাহাকে মানুষের প্রাণ না বলিয়া আর কি বলিব? এজন্যই বলা হইয়াছে "টানই প্রাণ।"

ভাবই লাভ।

ভাব ছাড়া ঈশ্বরকে চক্ষে দে'খে হাতে ধ'রে লাভ করিয়াছে, যে এ কথা বলে, সে ঈশ্বরকে লাভ করে নাই; কেননা ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপ, তাঁহাকে অন্তরে ছাড়া, ভাব ছাড়া দেখিবার সাধ্য নাই। আত্মীয়গণ! বল ত ভাব ছাড়া ঈশ্বরকে কেহ লাভ করিয়াছে কি না? এবং ঈশ্বরকে দেখে না, জানে না এমন কেহ আছে কি? না, না, এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে জ্বলিতেছে। এই জ্বলন্ত অগ্নির গুণেই আমাদের হৃদয়াগার আলোকিত হইয়া চক্ষে দেখে; যেমন সম্মুখের বস্তুকে বিশ্বাস করি, এবং চক্ষে না দে'খে আমাকে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, এইরূপ সেই পূর্ণ ব্রহ্ম যে জগতের প্রাণ তাঁহাকে হৃদয়গৃহে সকলেই দর্শন করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতেছি। বল ত ভাই! এই ভাবে সকলেই লাভ করিয়া এক দিন বা এক বারও প্রেমের অশ্রুধারা চক্ষে বহিয়াছে কি না? যদি বহিয়া থাকে, তবে অবশ্য জান ভাবই লাভ, না আর কোন লাভ আছে।

লক্ষ্যই সপক্ষ।

গণনায় যে, ১০০ হাজারে এক লক্ষ হয় এ তাহা নহে। বন্দুক, তীর বা গুলা'ল ধরিয়া যে নিশান করে এবং ইহা করিব, ঐখানে যাইব ইত্যাদিরূপ মনের যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা, তাহাই লক্ষ্য। যে বিষয়ে মনে কোন লক্ষ্য না থাকে, কেহ তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। কোথায় যাইবে তাহা মনস্থ না থাকিলে, কেবল বেড়িয়া বেড়াইলে, পায়ের অভ্যাসে পথ চলিলে, উদ্যমবিহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলে, যেমন কোন বাধা বিঘ্ন দেখিবামাত্রই লোক ফিরিয়া আইসে, অপর পক্ষে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উদ্যমের সহিত চলিয়া গেলে, সম্মুখস্থিত রাস্তায় কাঁটা জঙ্গল, নদী, খাল, মাঠ, মেঘ, বাদল ইত্যাদি যে কোন প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা ঘটুক না, সমস্তই পার হইয়া লক্ষ্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। তেমন যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে লক্ষ্য স্থির না করিয়া বেড়িয়া বেড়ায়, অর্থাৎ দেখাদেখি হুজুগে কার্য্য করে, সে কষ্ট বিপদ্ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে। আর ঐ যে লোকে বলে,—"লক্ষ গুলি পক্ষ তীর, তবে হয় লক্ষ্য স্থির" এটি ঠিক কথা; কিন্তু কোন নিশান না ধরিয়া যদি এক লক্ষ গুলি ছাড়ে, কিংবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত তীর মারে, তাহাতে কি হইতে পারে? বস্তুতঃ লক্ষ্য যদি পক্ষে না থাকে, তবে কোন কার্য্য সাধন হয় না; এ জন্যই বলি, "লক্ষ্যই সপক্ষ"।

ব্রহ্মই ধর্ম্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। সত্য কি? না, যাহা অটল ও অব্যর্থ। এই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর কাহার

কোন সাহায্য না লইয়া, কিছু না হইতে অখণ্ড নিয়মের সহিত এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন; জ্ঞানরূপে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী হইয়া, আমাদিগকে যাহার যাহার উপযুক্ত জ্ঞান দিয়া এই জগতে আমাদের কাহার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। আর অনন্তস্বরূপদ্বারা জগতের অবলম্বন হইলেন, এবং একাকী সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়া অদ্বিতীয় হইলেন; কেননা আপনিই জগৎ ভরিয়া আছেন, আর কে কোথায় আসিবে? অতএব এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এই ঈশ্বর আমাদের যাহার যে স্বভাব চরিত্র দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাহার ধর্ম্ম হইয়াছে। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম জ্বলন, জলের ধর্ম্ম তরলতা, এইরূপ পশুপাখী বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলকেই যাহার তাহার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দিয়া খাড় করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই মানুষের ধর্ম্মের শেষ হয়না। মানুষ এই সকল ধর্ম্মকে স্বভাব বলে; আর তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে যে একটি সত্যধর্ম্ম আছে, যাহার কথা পরে বলিতেছি, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বোঝে। সে বলে "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" অর্থাৎ একমাত্র তাঁহার উপাসনা-দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। জগতের উপর ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা তাঁহার দত্ত জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারিয়া ভক্তি ও প্রীতির সহিত প্রতিপালন করাই আমাদের আসল ধর্ম্ম, তাই ব্রহ্মই আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ আদর্শ। তিনি সকলকে দয়া করেন, আমরা তাহা করিলেই ধর্ম্ম করিলাম, এবং শরীর যেমন আত্মার বশে থাকিয়া সর্ব্বদা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে, আমরাও এই প্রকার ঈশ্বরের শরণাগত থাকিতে পারিলেই ধার্ম্মিক হইলাম। ফলেও জীবে দয়া, নামে ভক্তি,

ইহাই জীবের ধর্ম্মকর্ম্ম, এ ছাড়া আর ধর্ম্ম জানি না। অতএব বলা হইয়াছে "ব্রহ্মই ধর্ম্ম"।

সত্যই তত্ত্ব।

অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের যে তত্ত্ব তাহাই সত্য, আর পৃথিবী সম্বন্ধে যে তত্ত্ব—ভূমিতত্ত্ব বা প্রাণীতত্ত্ব কিংবা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, অথবা ভাষা-তত্ত্ব ইত্যাদি যে সকল তত্ত্ব তাহা সত্য তত্ত্ব নহে। কেন না এ সকল চিরকাল থাকে না। শাস্ত্রে এ সকলকে সামান্য অপরা বিদ্যা বলে। যথা—

"অপরা ঋগ্বেদোযযুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষাকল্প ব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দজ্যোতিষমিতি।"

আর যাহার প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী, যে বিদ্যাদ্বারা আমাদের ঈশ্বরবোধ জন্মে, তাহাকেই পরাবিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা বলে। এই তত্ত্বজ্ঞান অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করিবে না। যথা—

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।"

অর্থাৎ মৃত শরীরকে আত্মীয়জনেরা কাষ্ঠ বা মৃত্তিকার ন্যায় শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়, আর ফিরে চায় না; কিন্তু ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। এমন ঈশ্বরের যে তত্ত্ব অর্থাৎ সংবাদ তাহাই সত্য। অতএব বলা হইয়াছে "সত্যই তত্ত্ব"।

বিশ্বাসই নিশ্বাস।

নিশ্বাস না থাকিলে যেমন মানুষ মরা, এমন ঈশ্বরেতে বিশ্বাস না থাকিলেও মানুষ মরা। তবে বিশ্বাস কি? না, আছে বলিয়া যে জ্ঞান

বিশ্বাসের মূল অর্থ তাহা। যেমন একখানি অন্ধকার ঘরে আমি বসে আছি, এমন সময় সেই ঘরে দীপ আসিলে কেহ না বলিয়া দিলেও বুঝি যে, ঘর প্রকাশ হইয়াছে, এবং আমার আত্মাকে আমি দেখি না সত্ত্বেও যেমন আঁছি, অর্থাৎ আমি জীবন্ত, আমার প্রাণ আছে এই বলিয়া বিশ্বাস করি, এই সকল যে জ্ঞান ইহাকেই বলে বিশ্বাস।

ঈশ্বর আমার আছেন, তাঁহার নিয়তি অনুসারে আমি চলিতেছি, এবং একাকী নির্জ্জনে বসিয়া যখন ঈশ্বরচিন্তা করি তখন যে আমাদের প্রাণে ঈশ্বরের প্রতিভা প্রকাশ পায় ও তিনি থাকিতে আমার কোন চিন্তা নাই, অথবা কোন শিশুর মা বাপ ইত্যাদি মুরাব্বিসকল আছে বলিয়া জ্ঞান থাকিলে যেমন সে খাতিরজমা হইয়া চলে, কোনরূপ নিরাশা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই ভাবে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া নির্ভরপূর্ব্বক শান্ত এবং সন্তুষ্ট থাকাই ঈশ্বরেতে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহারই নিশ্বাস আছে, এবং যাহার মুরব্বি নাই সে যেমন আপনাকে মৃতবৎ নিঃসহায় অনাথ বলিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, এবং যেমন দিল্লীর বাদশা আছে জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, সে থাকাতেও যাহা না থাকাতেও তাহা, ঈশ্বরকে যদি এইরূপ সম্পর্কশূন্যভাবে বিশ্বাস করি তাহা বিশ্বাস নহে; কারণ, ঈশ্বরের প্রেম ভক্তিতে যদি আমার প্রাণ সঞ্চার না হইল, হৃদয়ফুল না ফুটিল, নির্ভয় হইতে না পারিলাম, তবে কি বিশ্বাস করিলাম? ঐ যে দীপের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ যদি আলো বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ না দেখিলাম, তবে আর আমার জীবনের নিশ্বাস রহিল কোথায়? নিশ্বাস আছে অথচ ফাঁফর লাগে ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর আমার প্রাণ, তাই আমি জীবিত এই বিশ্বাসের নামই নিশ্বাস।

নিয়তিই পতি।

এই যে বলে "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে," ইহা বস্তুটা কি? না, ঈশ্বরের ইচ্ছা। পূর্ব্বে কেবল ঈশ্বর বিনা আর কিছুই ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল আর সুন্দর অখণ্ড নিয়মের সহিত এই জগৎ সংসার প্রকাশ পাইল। যেমন রৌদ্রের জন্য সূর্য্য, জ্যোৎস্নার জন্য চন্দ্র, পাক ইত্যাদির জন্য অগ্নি, শীতলতার জন্য জল ইত্যাদি সমুদয় চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে, তেমন ঈশ্বরের কোন না কোন কার্য্যের জন্য আমিও সৃষ্ট হইয়াছি, এ কথায় সংশয় নাই। তাই আমার দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-ইচ্ছাই আমার নিয়তি, সেই নিয়তির টানেই সেই সেই কার্য্যে মতি, গতি শক্তি অন্য অপেক্ষা আমার বেশী দেখিতেছ; কারণ, আমায় সেই উপযুক্ততা না দিলে আমার দ্বারা সে কার্য্য লইবেন কি প্রকারে? অতএব ঈশ্বর-ইচ্ছাকে যেমন কেহ বাধা দিতে পারে না, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাতেই পরিপূর্ণ হইতেছে ও হইবে; স্ত্রীলোকের যেমন স্বামীই পরিচালক, স্বামীই তাহাকে শাসন ও সংরক্ষণ করে, এমন আমাদেরও পরিচালক সেই ঈশ্বর-ইচ্ছা, নিয়তি। অতএব বলা হইতেছে "নিয়তিই পতি"।

এই নিয়তির দিকে চাহিয়া কে পাপী, কে পুণ্যবান্ এবং কি পাপ কি পুণ্য তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কারণ, হইতে পারে আমি যাহাকে দেখিয়া ভণ্ড বা পাপী মনে করি সে বাস্তবিক তাহা নহে, এবং এক জনকে মহারোগে রুগ্ন বা মদ্যপানে মত্ত হইয়া খানায় পড়িয়া আছে বলিয়া পাপী মনে করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যে এরূপ লোকের দরকার, তাহাদিগকে দিয়া

ঈশ্বর আমাদের কি মঙ্গল সাধন করিতে চাহেন তাহা আমরা জানি না, বা জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু এ কথা জানি যে ঈশ্বর-ইচ্ছা বিনা বৃক্ষের একটি পত্রও ঝরে না। তাই বলি অনর্থক বিচার করিয়া আমাদের জন্য ঈশ্বর যে প্রেমের সরোবর দিয়াছেন তাহা ঘাটাঘাটি করিয়া ঘোলা করার দরকার কি? আমরা ত গাধা নহি? আমরা মানুষ, এ কথায় যেন হুঁষ থাকে।

সমানই মান।

গুরু এই কথা বলিলেই লঘু আপনা হইতে সৃষ্ট হয়। অতএব আমাকে গুরু ভাবিলে অন্যে লঘু, ইহা না হইয়া পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে বলে "অন্যোন্য গুরবো বিপ্রাঃ" অর্থাৎ সকলেই সকলের গুরু, একথাটি যথার্থ। কেননা জগৎবাসী নরনারী সকলেই সকলের নিকট শিক্ষা পায় ও দেয়, তবে আমি তোমার কাছে দশ বিষয় শিখি, তুমি আমার কাছে পাঁচ বিষয় শিখ। এই মাত্র প্রভেদ।

ফলে লঘু গুরু ভাব ভয়ানক মারাত্মক। কেননা এই ভাব হইতেই হিংসার আরম্ভ, এই আরম্ভ ধরিয়া জগতে কি না হইতেছে সকলেই জানেন। হিংসাতে প্রেম বা ভক্তি থাকে না, আর অহিংসা সাম্যভাব অর্থাৎ প্রেম বিস্তার করে। তুমিও আমার মত, আমিও তোমার মত, কেহই লঘু বা গুরু নই, অথচ কেহ আমাকে ছাড়াইতে পারে না, যাহার যাহা এই নিয়তি লইয়া, গুণ লইয়া সে-ই বড়। যেমন গুণ তুলনায় পিপ্ড়া হস্তী হইতে ছোট নয়, এবং হস্তীও বড় নয়; কারণ, পিপ্ড়ার যে গুণ আছে তাহা হস্তীতে নাই, আর হস্তীতে যে গুণ আছে তাহা পিপ্ড়াতে নাই, যাহার যাহার গুণে সে-ই বড়। সুতরাং সকলই যদি বড়, তবে কাজে কাজে সমান। বস্তুতঃ সমানেতেই প্রেম।

অসমানেতে প্রেম কোথায়? মনে কর তুমি যদি আমাকে নীচ ভাবিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক আমার ছায়া স্পর্শ করিয়া স্নান করিতে চাও, তবে কি তোমাকে আমি ভালবাসিতে পারি? কখনই না। অতএব অহিংসাই পরমধর্ম, কেননা তাহাতে প্রেম পরিপূর্ণ। যদি সুখী হইতে চাও, জগতের সঙ্গে হাসাহাসি গলাগলি করিয়া সত্যধর্ম্মের আনন্দ ভোগ করিতে চাও, তবে গুরু লঘুর কথা ছাড়ান দিয়া সমানের কথা ধর। সরল হও, শান্ত হও। কেননা সর্প যে প্রকার সিধা না হইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ সরলতা বিনা সমানের ভাব ধারণ করা যায় না। অতএব বলা হইয়াছে "সমানই মান"।

অনুরাগীই বৈরাগী।

সংসারে বৈরাগী বলে তাঁহাকে, যে ব্যক্তি সমুদয় ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া যায়। কিন্তু সত্য বৈরাগী তিনি, যে ব্যক্তি ঈশ্বরানুরাগ থাকাতে তাঁহার প্রিয় জগৎকেও অনুরাগ করেন। চলনসৈ বৈরাগী মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, সংসার গৃহস্থি এ সকল ছাড়ে, আর সত্য বৈরাগী এ সকল ঈশ্বরের দান বলিয়া এ সমুদয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুরাগের সহিত সেবা করেন। যেমন সতী নারী তাঁহার পতির প্রিয় যাহা তাহাকে ভালবাসে, যত্ন করে; বৈরাগীও সেই প্রকার ঈশ্বরের প্রিয় জগদ্বাসী সকলকেই ভালবাসেন, সেবা করেন, কিছু বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করেন না; বরং পরিত্যাগ করা অধর্ম্ম বলিয়া জানেন। কেননা তাঁহার বিশ্বাস যে সংসার আমরা নিজেরা গড়াইয়া লই নাই, যিনি ধর্ম্মরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সংসাররাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসার আর ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যে দুই ভাগ করি ফলে তাহা দুই নহে, সংসার ও ধর্ম্ম

আর ধর্ম্ম ও সংসার এই উভয় এক পদার্থ, এই ভাবিয়া বিরক্ত হওয়া বা পরিত্যাগ করা অসঙ্গত। অতএব বলি, "অনুরাগীই বৈরাগী"।

রসেতেই বশ।

লোকে ঈশ্বরকে দেখে না শুনে না, তথাচ যে তাঁহাতেই মন প্রাণ দৌড়ে যায় ইহার কারণ কি? না, তাঁহাতে রস আছে। কি রস? তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে অবাক্। তোমাকে বলি যে ভাই! যখন উপাসনা কর তখন গদ গদ হ'য়ে তাঁহার দাস হ'য়ে থাকিতে চাও কি না? প্রাণ গ'লে যায় কি না? ঐ যে গলে ইহাকেই বলি রস; এই মানুষকে বশ করে, সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। আর বলি রস ছাড়া কেহই বশ হয় না, এবং বশ না হ'লেও রস বুঝে না; যে যাহার রস পাইয়াছে সে-ই তাহার বশ হইয়াছে। তাই আমরা যখন ঈশ্বরের নামের, প্রেমের রস পাই, তখনই তাঁহার বশ হই, অন্যের ধার ধারিতে আর ইচ্ছা হয় না। অতএব বলি "রসেতেই বশ"।

বশই যশ।

যশের অর্থ সুখ্যাতি। আমাদের যশ কি? বিদ্যায় যশ, বুদ্ধির যশ, দান খয়রাতের যশ, এ সকল কি? এই যশ পাইয়া কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? না কখনই না। তবে যশ কি? ঐ যে বলা যাইতেছে ঈশ্বরের বশ তাহাই আমাদের প্রকৃত যশ। যে ব্যক্তি ভগবানের বশ তাঁহা হইতে আর যশস্বী কে? অন্য যশ লোকে লোককে সম্মুখে করিলে মুখ ফিরায়, আর ঐ যশের কথা কাণ পাতিয়া শুনে। সতী নারী যেমন পতির সোহাগের

কথা শুনিলে আনন্দে আটখানা হয়, এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মা সেই অনুরাগের কথায় পুলকে পরিপূর্ণ হন। অতএব বলা হইয়াছে "যশই যশ"।

নামই কাম।

ছেলেরা যেমন মায়ের নিকট থাকিতে ভালবাসে, এমন সমুদয় নর নারীই ঈশ্বরের নিকট থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু যে ঈশ্বরকে যোগিঋষিগণ পায় না, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া থাকিব? না, তাহার উপায় আছে। সেই উপায় কি? না, ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকা। কেননা নাম এবং নামীতে আমরা যেমন ভিন্ন, ঈশ্বর তাহা নহে। তাঁহার রূপ আর গুণ এক। কিন্তু নামগ্রহণেতে একটুক সাবধান হইতে হইবে, যেন নামাপরাধ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। বৃথা নামোচ্চারণ অর্থাৎ মনঃসংযোগ না করিয়া বিছা মাড়াইলে যেমন অনেকে রাধাকৃষ্ণ বা রামরাম করিয়া উঠে, এইরূপ নাম গ্রহণ করাই বৃথা নাম। সেই বৃথা নামোচ্চারণেই এক প্রকার নামাপরাধ ঘটে। আর নামেতে পূর্ণতা অর্থাৎ এই নামেতেই ষোলআনা আছে, এই ভাবে গ্রহণ না করিলে অপূর্ণতার ভাবে নাম গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার অপরাধ। যেমন কেহ কেহ বলে যে সমুদয় নামের সমুদয় গুণ নাই, ভিন্ন ভিন্ন নামের গুণ ভিন্ন ভিন্ন—অতএব নানা নামে ডাকে, এবং কেহ কেহ সকল নামই ঈশ্বরের, অতএব যে নামে ইচ্ছা সেই নামে ডাকি, এই বলিয়া উদারতা প্রদর্শন করে। কিন্তু কথা এই, ঈশ্বর পরিপূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, অতএব ভিন্ন ভিন্ন নামের যদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার করি তবে নাম নামী এক

বলা যাইতে পারে না। কারণ, নাম যদি অপূর্ণ তবে নামী পূর্ণ কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব সতী নারী যে প্রকার আপন পতিকে তাহার ষোলআনা সুখের স্থান বলিয়া বিবেচনা করে, অন্যত্র আর কোন কামনা বাসনা স্থাপন করে না, এরূপ আমাদের কোন নামের সম্পূর্ণভাব ধারণ করিয়া এক নাম গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। আর উদার ভাবের প্রতি বক্তব্য এই, নাম দুই প্রকার আছে, এক নাম আর নামাঙ্গ। নাম কি? ব্রহ্ম, হরি, কালী, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি এবং ভিন্ন ভাষাতে আল্লা, গড্, করতরা ইত্যাদি। আর নামাঙ্গ কি? না, নামের বিশেষণ যথা দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময় ইত্যাদি যাহা সেই মূল নামে যুক্ত হয়, যেমন দয়াময় হরি, কৃপাময় ব্রহ্ম ইত্যাদি; অতএব নামাঙ্গ যাহা তাহা মূল নামে যোজনা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আর মূল নামের এইরূপ উদারতাদ্বারা সেই সেই নামের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। আর বলে যে, ব্রহ্ম যাহা হরিও তাহা, ইহাতে প্রভেদ নাই। হে উদার আত্মীয়গণ, বল দেখি, যদি হরিই ব্রহ্ম হইল, আর ব্রহ্মই হরি হইল, তবে এক নাম না লইয়া দুই তিনটি লইবার তাৎপর্য্য কি? সতী নারী ত তাহা করে না। যখন দুই তিনটি নাম নেওয়া যায় তখন অবশ্য বিশ্বাস কর যে একনামে পূর্ণতা নাই। কেননা অভাব না হইলে কেহই অন্য অন্বেষণ করে না। অতএব যে নামে যাহার প্রাণ বিকশিত হয় তাহার সেই এক নাম লওয়াই সঙ্গত, নতুবা নামঘটিত ব্যভিচার হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। একেতে নিষ্ঠাবান হওয়াই সতী এবং সাধুর কর্ম্ম। দুইয়ের প্রতি অনুরাগ যাহার আছে তাহাকে সতী বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাহা সত্য কার্য্য নহে। এরূপ ঈশ্বর-পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিও যদি দুইয়ের প্রতি অনুরাগী হইলেন, তবে তাঁহাকে

ঈশ্বরপরায়ণ বলা যায় না। দুয়েতে এক নাই, আর একেতেও দুই নাই; দুই যাহা তাহা দুই-ই, এক যাহা তাহা একই। অতএব একে অনুরক্ত হওয়াই সত্য।

উপকথা।

অগ্নি তৈল দ্বারা যখন মানুষ আলো করে তখন রাজা প্রজা বড় ছোট বিশেষ থাকে, কেননা কেহ শত দীপ, কেহ একটি বা নাস্তি দীপ থাকে। কিন্তু যখন আকাশের চন্দ্র উদয় হয় তখন সকলখানেই সমান প্রকাশ। এমন বাহিরের বিষয় ধরিয়া যদি বিচার করি তবে রাজা দরিদ্র ইত্যাদি ভেদাভেদ অনেক দেখি, কিন্তু অন্তরের দ্বারা রাজা দরিদ্রে ভেদ নাই, সকলের প্রাণই এক ভগবান। রাজার ঘরে যে ধন দরিদ্রের ঘরেও সেই ধন; কেননা দরিদ্রও যদি আপন অল্প পরিমিত আয়েতে সন্তুষ্ট থাকিয়া "আমি যাহা পাইবার যোগ্য ভগবান আমাকে তাহাই দিয়াছেন, অধিক নিয়া আমি কি করিব?" এই বলিয়া সন্তুষ্টচিত্ত থাকে তবে সে ব্যক্তিই রাজা; আর রাজা অটল রাজত্ব সত্ত্বেও যদি সন্তুষ্ট না থাকিয়া লোভ, পিপাসায় মরে, তবে সে-ই যথার্থ দরিদ্র। দরিদ্র আপন পুত্রটী কোলে লইয়া যেরূপ তুষ্ট, রাজা বড় লোক সে বিষয়ে তাহা হইতে এক বিন্দুও বেশী সুখী হইতে পারে না। অতএব উচ্চ নীচ বিচার কেবল মানুষের মাত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইতর বিশেষ নাই।

যদি মানুষ হইতে চাও, সুখী হইতে চাও, তবে কাহাকে ধরিয়া পাপী না পুণ্যাত্মা এ কথার বিচার করিতে যেও না। কারণ, পাপ পুণ্যের বিচার ঈশ্বর বিনা তোমার আমার করিবার সাধ্য নাই। আমরা আপনাকে বিনা অন্যের কিছুই জানিতে পারি না। অতএব আপন

বিচার আপনি করিয়া মানুষ হও। সাবধান! শিশুকালে যে তোমাকে সকলে ভালবাসিয়া মুখ চুম্বন করিয়াছে, সেই তোমাকে যেন যৌবন বা অন্ত বয়সে দেখিয়া ভয় কিংবা সন্দেহ না করে। তোমার প্রিয় সকলে, তুমিও সকলের প্রিয়, সকলের তুমি যাহা, তোমারও সকলে তাহা; আয়নায় মুখ যেরূপ হাসিলে হাসা. কাঁদিলে কাঁদা দেখা যায়, সংসারে এইরূপ আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমাকে অবশ্য ভালবাসিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই প্রেমরাজ্যে পাঠাইয়াছেন, অতএব আমরা যত প্রেম করিতে পারি ততই ভাল। বৃথা অনধিকারচর্চ্চা করিয়া সে পাপী সে দুরাত্মা ইত্যাদি ভাবিয়া সুখের রাজ্যে দুঃখ আনিব কেন?

পাপী বলিয়া যাহাকে জানি তাহাকে ঘৃণা করি, আর পুণ্যাত্মাকে শ্রদ্ধা করি, এই আমাদের অভ্যাস। কিন্তু পাপী যে পুণ্যাত্মা বানায় এবং ছোট যে বড় বানাইয়া দেয়, এ কথা আমরা তত ভাবিয়া দেখি না বলিয়া এই ঘৃণা। ভাবিয়া দেখ, পাপে দুর্ভোগ হয়; সে দুর্ভোগভোগী লোককে যে দয়া করে সে-ই পুণ্য করে; অতএব পাপীই পুণ্যাত্মা বানাইল কি না দেখ। আর যত যত বড় মানুষ আছে বা হইতেছে ছোট লোকই তাহার কারণ; কেননা ছোটলোকে রৌদ্রে ঘামিতে ঘামিতে যে চাষ আবাদ করিয়া শস্য জন্মায়, খাজনা দেয় সেই খাজনা ও শস্য দ্বারা জমিদার, তালুকদার, রাজা, কোজা, জগতশেঠ, রেলিব্রাদার্স ইত্যাদি সব বড়লোক, মাবার লোক সৃষ্টি হইতেছে; তথাচ ছোট বলিয়া যে ঘৃণা এটি অন্যায়। ছোট বড় আমরা বুঝি কি? আমরা যাহার দাম বেশী দেখি অর্থাৎ যাহার কাছে বেশী টাকা দেখি তাহাকেই

বড় বলি। যেমন লোহাকে বলি ছোট আর সোণাকে বলি বড়। কিন্তু লোহা যদি এক দিনও না থাকে তবে সমুদয় সংসারের কার্য্য কর্ম্ম বন্ধ হয়। কেননা অস্ত্রশস্ত্র বিনা কে কোন্ কার্য্য করিতে পারে? আর সোণা যদি মাস মাসও না থাকে, তথাচ লোকের কোন কষ্ট হয় না। এইরূপ দেখিয়াও সোণাকে বড় বলি। ফলে ভাবিলে লোহাই বড়।

আমরা অন্যের দোষ যত দেখি আপনার দোষ তত দেখি না, কিন্তু লোকে অন্যের দোষ দেখিতে দেখিতে যে-প্রকার আপনার প্রতি অন্ধ হয়, তেমন আপন দোষ দেখিতে দেখিতেও লোকে এরূপ অন্ধ হয় যে, আমি পাপী, আমি নরাধম ইত্যাদি ভাবে আপনাকে সে একেবারে অঘস্ত করিয়া ফেলে। অতএব আপনার বা অন্যের দোষানুসন্ধানে সর্ব্বদা রত থাকা অপেক্ষা পদে পদে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের গুণ দেখিয়া উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সন্তুষ্ট-চিত্তে থাকাই উচিত।

আমরা যে ভূতের বেগার খাটি বলিয়া বলি এটা মিথ্যা নহে; কেননা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুই কালকে নিয়ত ভূতে লইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ ভূতকালে পৌঁছিতেছে। দেখ যত কার্য্য কর্ম্ম করিয়াছি, যত করিতেছি, সকল সেই ভূতকে দিতেছি। ভূতকে মনে পড়ে, বর্ত্তমানকে দেখি, কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এক নিমেষ পর সে কি হইবে তাহা জানি না। এইরূপ পরলোক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজ্যও আমরা জানি না, কিন্তু যেমন ভবিষ্যৎ কাল আছে, এমন

ভবিষ্যৎ রাজ্যও (পরকাল) আছে, কিন্তু অন্ধকার। দুই দণ্ড পরে কি হইবে তাহা যে বলে তাহাতে যেমন বিশ্বাস করিতে পারি না, এমন পরলোকে কি আছে কি হইবে ইত্যাদি যে বলে তাহা বিশ্বাস করি না। কেননা যাহা জানিবার সাধ্য নাই তাহাকে কল্পনা বিনা আর কি বলিবে? এই কল্পনা ধরিয়াই লোকাচার-নিয়মে প্রায় সকলেই পরকালে একটা তজবিজের কথা বলে। কেহ বলে যম রাজা, কেহ বলে রোজ কেয়ামতের দিন ঈশ্বর বিচার করিবেন ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা ভাবিয়া দেখি না যে, ঈশ্বর কাহার সাহায্য লন না, কিম্বা কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেও পারে না। তিনি নিজ গুণেই সমুদয় করিতেছেন, তাঁহার নিকট যম রাজা কি রোজ কেয়ামত কিছুই লাগে না।

লোকে শরীরকে অথবা চক্ষে যাহা দেখে তাহাকেই সাকার বলে, আর আত্মাকে সাকার বলে না; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যত ভক্তি, যত মায়া, যত বিশ্বাস, যত মানামানি সকলি সেই নিরাকার। কারণ, প্রত্যেক আমি যে আমাকে এত বিশ্বাস করি, যাহার মত বিশ্বাস আর কিছুতে নাই, কি দেখিয়া এই বিশ্বাস? আমাকে কি আমি চক্ষে দেখিতে বা দেখাইতে পারি? লক্ষপতির মৃত শরীর আধপয়সার মূল্য জানিয়া লইতে চাই না কেন? আত্মীয়জনের মৃত শরীর চক্ষের সম্মুখে থাকা সত্বেও সে নাই বলিয়া শোক দুঃখ করি কেন? যদি শরীরই ভালবাসিবার বা বিশ্বাস করিবার জিনিষ হইত তবে আর আমাদের এই দশা কেন? আবার লোকে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বানাইয়া পূজা করে দেখি; এই পূজা যদি খড় মাটী ইত্যাদি নির্ম্মিত

প্রতিমারই হইত তবে আবার সেই মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয় কেন? অতএব বলি নিরাকারই আসল আকার, আর সাকার বলিয়া যাহাকে ভাবি ইহা কিছু নহে। আমাদের এই ভ্রান্তি জন্মিবার কারণ কি? না, সর্ব্বদা জড়বস্তু সকল দেখিতে দেখিতে আমাদের এমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, সাকার ভিন্ন আর যেন কিছু আত্মা গ্রহণ করিতেই পারে না। এমন কি কত বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও বলেন যে, "নিরাকারের আবার উপাসনা হয় কি প্রকারে?" কিন্তু উপরের দৃষ্টান্ত সকল দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য প্রতীতি হইবে যে, যত মান যত ধ্যান সকলি আমরা যাঁহাকে নিরাকার বলি তাঁহার।

ভক্তকালীনারায়ণের লিখিত কতিপয় প্রবন্ধ ও কবিতা

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানী কালীনারায়ণ সাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সরল দৃষ্টান্ত সহিত ১২৮৯ সনের আশ্বিন মাসে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে সংক্ষেপে তাঁহার মত উদ্ধার করিতেছি।

"ব্রহ্মজ্ঞানবলেই মানুষ ইতর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দরিদ্র, মূর্খ কাঙ্গাল, কুলীন যে কোন অবস্থার মানুষ থাকুক ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের চক্ষু। ব্রহ্মজ্ঞান

মানুষের আত্মা ও জীবন। ব্রহ্মজ্ঞান যাহার জন্মে নাই পশুতে তাহাতে কোনও প্রভেদ নাই। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে সকলেরই উপনীত হওয়া চাই।

ঈশ্বর আছেন মানুষের এই স্বাভাবিক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। ইহার অভাবে কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান মানুষের সম্ভবে না। ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে বলিতেছে ব্রহ্ম একজন এবং তিনিই সকলের উপাস্য। চক্ষুর অভাবে যেমন কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রাণের চক্ষুর অভাবে ব্রহ্ম যে জগতের প্রাণ, জগতের জীবন ইহা জানিবার সাধ্য থাকে না।

ব্রহ্মজ্ঞানবলে বুঝিতে পারি আমি নিরাকার এবং ঈশ্বর নিরাকার, আমি আছি এবং ঈশ্বর আছেন। শরীরে আমি যতক্ষণ ততক্ষণ শরীর জীবন্ত; আমার বিরাম হইলেই শরীর মৃত অকর্ম্মণ্য। শরীরের আত্মা আমি. আমার আত্মা ঈশ্বর। আমি না হইলে যেমন শরীর মরা, ঈশ্বর না হইলে সেইরূপ আমি মরা। আমারা শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যেরূপ আমি, জগতের সকলেতে ব্যাপ্ত সেইরূপ ঈশ্বর। এজন্য ঈশ্বরকে প্রাণস্বরূপ কহে। তিনি জড় জগৎ ও চেতন জগৎ সকলেরই প্রাণ।

ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মদত্ত ধন। তাহা তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া আমা-দিগকে বুঝাইয়া দেন। অপরে তাহা সম্যক্ বুঝাইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান জানে না, তাহার সকলই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। এই ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন স্বাভাবিক ও নিত্য, ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি স্বাভাবিক ও নিত্য। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে যাহা আদেশ করে তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য, আর তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

যেরূপ বাহিরের বস্তুসকলের এক একটির এক এক ধর্ম্ম আছে, তেমনি আত্মার একটি ধর্ম্ম আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে ব্রহ্মেতে উপনীত করে। এই ধর্ম্ম লাভ করিয়াই কেহ আচার্য্য, কেহ সাধু, কেহ চৈতন্য, কেহ নানক, ঋষি, ভক্ত হইতেছে এবং চিরকাল হইতে থাকিবে ও হইয়া কৃতার্থ হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে থাকাতেই ব্রহ্ম-রস, যাহার তুলনায় জগতে আর কোন রস নাই, তাহা পাইবার জন্য লালায়িত হইতেছে। সেই রস স্বয়ং ব্রহ্ম সকলের অন্তরে নিহিত রাখিয়াছেন এবং সেই রস তিনি বুঝাইয়া দেন। নৌকাতে যেমন সাগরে গমন করি, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা আমরা ব্রহ্মেতে গমন করি।

প্রার্থনা।

হে প্রাণের প্রাণ পূর্ণ ব্রহ্ম, তোমার অমৃত রাজ্য তুমি না দেখাইলে কেহই দেখিতে পাইতাম না। তুমি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে তোমার ধর্ম্ম, তোমার মর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম কে বুঝিতে বা করিতে পারে? তোমার মহা প্রেমদ্বারা তুমি আমাদিগকে নিয়মিত না করিলে আমরা কেবল অন্ধ হই তাহা নহে, আমাদের শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি সকল অকার্য্যের হইয়া যায়। তুমি মহা যন্ত্রীরূপে আমাদিগকে না চালাইলে আমরা অচল। অতএব প্রার্থনা করি চিরকৃপার পাত্রকে কৃপা কর।

হে পরমাত্মা, তুমি বিনা আর বল, সম্বল কিছুই নাই। তুমি

অন্তর্যামী, জানিয়া শুনিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা কর, তোমার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ হইতে যে আনন্দ অমৃত] পাই, তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত রহিলাম। জয় ব্রহ্ম জয়, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

প্রাণ ব্রহ্ম, এই জগৎ সংসার, এই মনুষ্য, পরিবার, তোমারি সোহাগের ধন, তোমারই অতি আদরের জিনিষ। তুমি যেমন আমাকে চিন ও জান, এত অন্তর্যামী আর কে হইতে পারে? এই জগতের প্রতি তোমার যে ব্রহ্মটান তাহা ভাজিবার নহে। এই ব্রহ্মটান আমাদের প্রাণে যতক্ষণ না পশে ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান হয় না। তুমি যে প্রাণ-রূপে আমাদের দেহভাবে ব্যবহার করিতেছ, তাহা না জানিলে আর জীবন-সঞ্চার হইল না। জীবিত জীবন না হইলে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মূর্ত্তি আর আমিতে প্রভেদ কি? জীবন ছাড়া, আত্মা ছাড়া, দেহ থাকিয়া কি হয়? অতএব অন্তর্যামী প্রাণ, প্রার্থনা করি তোমার জগৎবাসী নরনারী সকলে তোমার আত্ম-দৃষ্টি প্রকাশ কর। তুমি যে আত্মা, আমরা যে দেহ, তুমি বিনা আমরা মৃত, অসার, তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাও। আমরা যে অনন্ত কূটস্থ অবস্থাধারা তোমার অনন্ত অমৃত রাজ্যে গমন করিতেছি, সেই চেতনা প্রদান কর। তোমার ব্রহ্মটানে যে আমরা চলিয়াছি, ইহা টের পাইতে দাও। প্রাণ, তুমিই আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছ, অমৃতের যাত্রী করিয়াছ। তুমি স্বয়ং অমৃত, আনন্দ; আনন্দ নিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছ। তুমি যেমন, তেমন করিয়া আমাদিগকে লও। আমরা কেবল তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমাদের সকলই পাইলাম। তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম, তোমাতে নাই এমন কিছু নাই। তুমিই

সকলের সকল। তোমার জয় অনন্ত কাল হইতেছে, হইবে। যে জীবনে তোমাতে বিরাজ করে সেই জীবিত মনুষ্য। যে জীবিত সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্তকে ব্রহ্ম বলিয়া আত্ম সমর্পণ করে। তোমার ভূমিতে পূর্ণ হইয়া তোমাতে প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে করিতে তোমার অনন্ত উপাসনায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। প্রাণ, তোমার দিকে যার দৃষ্টি সে সুন্দর বিনা আর কি দেখিবে? হে সুন্দর, তোমায় সৌন্দর্য্যে মগ্ন কর। জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম।

সদালাপ।

১। ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ও সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা; অতএব সমুদয় সংসারের ধর্ম্মও এক।

২। আত্মা শরীরের যাহা, ঈশ্বর আমাদের তাহা। ঈশ্বর আমাদের মাতা, পিতা বা গুরু ইত্যাদি নহেন, তিনি পরমাত্মা। অতএব শরীর আত্মার বশে থাকিয়া যেরূপ সর্ব্বদা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে, আমরাও সেরূপ ঈশ্বরের বশে থাকিয়া সর্ব্বদা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

৩। যদি সুখী হইতে চাও, তবে হিংসা পরিত্যাগ করিয়া জগৎবাসী সকলকে প্রেম করিতে শিক্ষা কর।

(৪) যাহার শরীর, মন, বাক্য শুদ্ধ সেই সিদ্ধ পুরুষ। নতুবা কেবল দান, ধ্যান, ভক্তি, পরোপকার ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

৫। নির্ম্মল চিত্তই তীর্থ, আর তীর্থ নাই। যাহার চিত্ত নির্ম্মল, সে সর্ব্বদা পবিত্র তীর্থে বাস করে।

৬। নিঃশ্বাস থাকিলে যেমন শরীর জীবিত, বিশ্বাস থাকিলেও সেই-রূপ আত্মা জীবিত। যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার নিঃশ্বাসও নাই, সে মৃত।

৭। দয়াময় ঈশ্বর ইহ ও পরলোকের কর্ত্তা, অতএব মরণের ভয় নাই। কেননা, এখানে যিনি সুখ দিতেছেন, সেখানেও তিনিই সুখ দিবেন।

৮। ঈশ্বর বিনা আর কিছুরই উপাসনায় ফল নাই; কেননা, ঈশ্বর বিনা আর কেহই পরিত্রাণ দিতে পারে না।

৯। সেই অবিনাশী ঈশ্বর আমাদের আত্মা, অতএব আমরা অমর; কেননা, আত্মা বর্ত্তমান থাকিতে শরীর মরিতে পারে না।

১০। সকলেই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট, অতএব জাতিভেদ কিছু না। এক গাছে পাঁচ জাতীয় ফল কি কখনও হয়?

১১। স্বার্থ ছাড়িয়া দেওয়াই বৈরাগী হওয়া, নতুবা সংসার ছাড়িয়া ভেক্ লইলে বৈরাগী হয় না; ইহা ভিক্ষা পাইবার জন্য।

১২। সংসার আর ধর্ম্ম দুই নহে, এক। কেননা, সকলই ঈশ্বরের দান। অতএব কামাদি ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া, সত্য ও ন্যায়ের পথে, ঈশ্বরের আজ্ঞামত সকল প্রকার সুখ ভোগ করাই ধর্ম্ম। যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয় নাই, তাহার সংসার ত্যাগ করিলে আরো বিপদ।

১৩। ঈশ্বরের পরশনে সকল পাপ ক্ষয় হয়; অতএব পাপ লইয়া ঈশ্বরের শরণ লইতে ভয় করিও না। দেখ, অঙ্গার যে এত কাল, তাহাও অগ্নি পাইলে কেমন ঝক্ মকা হইয়া যায়।

কবিতা।

কবিতায় বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল। সরল ভাষায়, সাদা কথায় যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী অপ্রকাশিত কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি!

আমি।

প্রাণ-ব্রহ্ম, আমির মর্ম্ম বলহ ভাঙ্গিয়া,
জুড়াই আমার প্রাণ শুনিয়া শুনিয়া।
তুমি বিনে আমি-তত্ত্ব কে বুঝাবে আর,
কে বুঝে আমির মর্ম্ম, আমির বিচার?
তব সৃষ্টি এই আমি, তুমিই কারণ,
তোমার নিয়তে আমার জীবন মরণ।
সাধিতে তোমার কার্য্য এসেছি ধরায়,
তোমার করণে কার্য্য আমারে করায়।
কায়া মায়া জায়া সুতা ধন পরিবার
কেহ নই আমি, এই সকলি আমার।
শরীর আর আমি এই যে ভাবিতেছি এক,
মৃত্যু দিয়ে দেখাইলে দুই বিনা এক।
শরীর আমির এই সম্বন্ধ দেখাইয়ে,
তুমি যে আমার 'আমি' দেও বুঝাইয়া।
যন্ত্রী হ'য়ে যন্ত্রবৎ কর ব্যবহার,
জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্ম কর্ম্ম যত কিছু যার।

তুমি আমার আমি, তোমার আর আমার নাই,
এই কথা বুঝিলেই হাতে স্বর্গ পাই।
অতএব যদি পাই তব পরিচয়,
তবে ত সে আমি-তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

গুরু।

ব্রহ্ম বিনা আর যাকে গুরু ব'লে বলি,
আসলেতে কিছু নয়, কল্পনা সকলি।
দীক্ষা-গুরু পূর্ণ ব্রহ্ম, শিক্ষা-গুরু নর,
এই ভাব সম্বন্ধই অতীব সুন্দর।
দীক্ষা-গুরু দেন হৃদে চেতনা ধরিয়া,
শিক্ষা-গুরু শিক্ষা দেন সে চৈতন্য নিয়া।

সাধু।

এক সাধু পূর্ণ ব্রহ্ম, আর সাধু নাই,
এই সাধু যার হৃদে, সেই সাধু ভাই।
সকল হৃদয়ে সেই সাধুর বসতি,
যবে চাই তবে পাই, নাই দিবা রাতি।
তুমি আমি বলি তাঁর ভেদাভেদ নাই,
সকল হৃদয়ে তাই সাধুতার ঠাঁই।
কে সাধু কি সাধু যদি চিনিবারে চাও,
সাধু মনে সাধু চক্ষে সিধা হ'য়ে চাও।
যারে দেখ গোপনীয় কার্য্য নাহি করে
সাধু জানি চিনে লও সেই শুদ্ধ নরে।

দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ গোপনীয় কাজে,
অসাধু বলিয়ে গণ্য সাধুর সমাজে।

মত্ততা।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যত কিছু বল,
মত্ততা বিহনে কিছু না হয় সফল।
মত্ত নহিলে তত্ত্ব-সুধা পায় কোন্ জন?
মত্ততায় মাতাইছে জগত ভুবন।
ব্রহ্মজ্ঞান-সুধা-মত্ত জনে মত্ত বলি,
এই ছাড়া যত মত্ত সব মাতোয়ালী।
ওহে ব্রহ্ম, তুমি-মদে মত্ত কর মোরে
নতুবা এ মত্ত মন নানা দিকে ফিরে।

আশা।

তিনি চির আশাপূর্ণ ছিলেন। নিরাশা, নিরানন্দ, অভাব তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইভাব তাঁহার ভাষাতে প্রকাশ করিতেছি—

"করুণা-নিধান পূর্ণ ব্রহ্ম আশারূপে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিয়া দিনে দিনে নবীন আশা পূর্ণ করিতেছেন এবং নবীন আশাতে জড়িত করিয়া সুখ হইতে সুখে লইয়া যাইতেছেন। মাতৃস্তন্য যেরূপ নীরবে শান্তভাবে পান করিতে পরম সুখ, এরূপ ভগবানের অযাচিত কৃপায় আশাকে হৃদয়ের গভীর স্থানে রাখিয়া দিতে পারিলে নিত্য নূতন ব্যাপার

দেখিয়া, ভোগিয়া, পাইয়া অনন্ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করিতে পারি। যেখানে নূতন আসিবার কথা নাই, সেখানে আশার সুখের আশা নাই। অতএব সর্ব্বদা নূতন হইতে নূতনে যাই, এই আমাদের চির আশা, এই আমাদের চির উল্লাস। অনন্ত দাতা ভগবান সর্ব্বদা এই আশা পূর্ণ করিয়েছেন ও করিবেন। এই আশাই আমাদের বাসা।

এই আশা-কল্পতরু সকলের ছায়া,
এই আশা চেয়ে চেয়ে যত কিছু মায়া।
উদার সুধার তার বিলাইতে নরে,
আশা-সদাব্রত পাতিয়াছে ঘরে ঘরে।
যত চাও তত আছে অনন্ত ভাণ্ডার,
সত্য কি না মিথ্যা কথা, কে না জানে তার?
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন আশার সুসার,
আশা পূর্ণ করি সবে করে ভবে পার।
না চাহিতে আগে দিয়ে বুঝাইয়ে রস
এই রসে জগতেরে করে চির বশ।
এই রসে বশ হ'য়ে প্রাণ যারে চায়,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তাহাই পূরায়।

ওঁ ব্রহ্ম বীজ।

জীব মাতৃগর্ভ হইতে বদ্ধমুখে ভূমিষ্ট হইলে "ওঁ" এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা প্রথম মুখ স্ফুট হয়। কথা এই, সন্তান বদ্ধমুখে ভূমিষ্ঠ হইলে অন্তরনিহিত ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নির ঊর্দ্ধবেগাবেগ বদ্ধ মুখমধ্যে সানুনাসিক

অস্ফুটধ্বনিতে 'ও' করে। যখন অন্তর্বেগ দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় বিস্ফারিত করে তখনই 'ম্' ধ্বনিত হইয়া ও এবং ম্ যোগে ওঁকার এই মহাবীজ প্রকাশ পায়। 'ম' অনুস্বার নহে, চন্দ্রবিন্দু. অতএব 'ও' এবং চন্দ্রবিন্দু যোগে ওঁকার বীজ। ধান্য যেরূপ জন্মিবার সময় দুইখান খোসা একত্রে মিলিত হইয়া বীজকে রক্ষা করে এবং পরিপক্ক করে, এরূপ 'ও' এবং 'ম্' খোসাদ্বয় এক হইয়া ওঁকার বীজ ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। যখন বীজ ফুটে তখন 'ওম্' রূপ খোসা সরিয়া যায়, কেবল ওঁ বর্ত্তমান দুই ভাঙ্গিয়া এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ভাবে এই মহাবীজ প্রকাশিত হয়। ইহাকে ওঁকার অর্থাৎ ওঁ স্মরণ বলে। ওঁকারের অগ্রে আর কোন শব্দ নাই, উচ্চারণ নাই, এমন কি ধ্বনিও নাই। এই ওঁকার উচ্চারণ হইতেই উচ্চারণ আরম্ভ। এই জন্যই ইহাকে প্রণব বলে। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট নব। এই নূতন প্রথম উচ্চারিত ব্রহ্মনামপূরিত ওঁকারকে বীজমন্ত্র জ্ঞানে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে! ওঁকারই ব্রহ্মবীজ, ব্রহ্মই প্রথম নাম। ইহা কল্পনার কথা নহে, সত্য কথা। এই নাম গ্রহণ করিয়া কার প্রাণে না ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে? কাহার প্রাণে না আনন্দ প্রেম ভক্তি জাগিয়াছে? এই জাগ্রত অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, ব্রহ্মানন্দভোগ। এই নাম পাইয়াই লোকসকল ভক্ত, প্রেমিক, বৈরাগী, অনুরাগী, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হইতেছে, হইবে। এ ছাড়া আর গতি নাই, পথ নাই।

ওঁকারের বৈজিক মুখ স্ফুরণস্বভাব দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক ভাবে বর্ত্তমান। এই ওঁকার উচ্চারণধারা চিরকাল মুখে স্ফুট হইয়াছে, হইতেছে। তুমি যে দেশী যে ধর্ম্মী কেন না হও, ওঁকার ব্রহ্মবীজ বলিয়া স্বীকার কর আর নাই কর, তোমার মুখ স্ফুট কিন্তু ওঁকারের টঙ্কারেই হইয়াছে, ইহাতে আর ভুল নাই।

ওঁকার স্বর নহে, হল নহে, বর্ণ নহে; ইহা অক্ষর অর্থাৎ ক্ষররহিত। ইহা হইতেই স্বর, হল, বর্ণাদি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমে 'ওম' উচ্চারণ করিতে যদি প্লুত অর্থাৎ ধ্বনি বা স্বর সঞ্চারিত হয়, তবেই 'অ' উচ্চারণে আসে; স্বর ধরিয়া প্রথম এই অ পাইলাম। অতএব ইহা আদি স্বর বলিয়া নির্ণিত হইল। অ বাঙ্গালা ভাষার আদি, অ আনেক আকারে পার্শির আদি, এ আকারে ইংরাজির আদি স্বর বোধ হয়। এইরূপ নানা আকারে পৃথিবীর প্রচলিত সকল ভাষার আদি স্বর অ। সুতরাং এই অ হইতে পৃথিবীর সমুদয় ভাষারাজ্য উদ্ভাবিত হইয়া নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তার করিতেছে ও করিবে।

ওঁ হইতে অ, অ হইতে সমুদয় ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকাশ। অতএব ওঁ ব্রহ্মবীজ। এই বীজের স্ফূরণে ব্রহ্মনাম মহামন্ত্রের প্রকাশ। এই নামমন্ত্র ইন্ধন হইয়া প্রতি মানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্ঞান-অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতেছে। তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া মানব সুখী ও অমর হইতেছে। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নাম, প্রথম নাম। এই নামকে নাম বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়। ইহাতে নাম নামী অভিন্ন। মা যেমন মায়ের নাম নহে, মা-ই মা স্বয়ং মা, মা আর কেহ বা কিছু নহে বা হইতে পারে না, এরূপ ব্রহ্মও ব্রহ্মের নাম নহে। ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম বিনা আর কেহ বা কিছু ব্রহ্ম নহে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।*

বিবিধ ।

গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং জমিদার, পুত্রেরাও উচ্চ রাজকর্মে নিয়োজিত ; ধন, মান, মর্য্যাদার কোনই অপ্রতুল ছিল না। তবু তাঁহার চাল-চলন অতি সাদাসিধে ছিল। কিছুমাত্র আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। "পরিধানে মোটা সাদা ধুতি, গায়ে সাবেকী জামা, আর পায়ে চটী জুতা। মহাসভায়ও তাঁহার এই পোষাক, আর কাঙ্গালের কুটীরেও তাঁহার এই বেশ। তিনি কোথাও রেলে যাতায়াত কালে পারত পক্ষে (ডাক্তারের কিম্বা বৃদ্ধ বয়সে আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ ভিন্ন) প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্মানিত, শিক্ষিত লোক। আমি আর তাঁদের সঙ্গে কি আলাপ করিব ? কাজেই বোকা বনিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে যে সব গরীব লোক থাকে তাদের সঙ্গে দুটা ধর্মের কথা বলিয়া আরাম পাই, সময় কাটিয়া যায়। কোন কষ্ট পাই না।"

তিনি সরল ধর্মপিপাসু লোক ছিলেন। ধর্ম-কথার আলোচনা করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। আর সরল সাধারণ লোকও তাঁর মুখে ধর্মের সহজ কথা শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইত। এ নিমিত্ত তাদের সঙ্গই তাঁহার প্রিয় ছিল। কিন্তু ইহাতে "অনেকে মনে করিতেন তিনি তাঁর অবস্থানুযায়ী মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন না।

---

* এই অধ্যায়ের অনেক স্থানে স্বর্গীয়া বিমলাদাস-রচিত পিতৃস্মৃতি হইতে গৃহীত।

একথা শুনিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন ;—"সমানে মান, ফলে সমানেই মান, সমান সমান মান না দিযে কে পেয়েছে মান ?"

"তাঁহার মুখে নিরানন্দ নিরুৎসাহের কথা কেহ কখনো শুনে নাই। বলিতেন 'উদার দাতার রাজ্যে 'নাই নাই' শব্দ উচ্চারণ করা আর তাঁহার অপার করুণার দান অস্বীকার করা একই কথা। তাঁর খাইয়া পরিয়া তাঁর প্রাণে জীবিত থাকিয়া আমরা কি এমনই অমানুষ হইব যে, অকৃতজ্ঞের মত কেবল 'দেও দেও' 'চাই চাই' বলিব ? না, না, তা হইতে পারে না। মুখে তাঁর নাম গান কর, হাতে তাঁর কাজ কর, আর তাঁর দয়ার দান উপভোগ করিয়া আনন্দে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাও। এর বেশী আর ধর্ম্ম কি আছে ?"

"এ নাম হৃদয়ে রাখিয়ে
হাতে রে সদা কাম কর।
সদা কাম কর, নাম স্মর,
স্মরিয়ে রে মন প্রাণ ভর।"

"একদিন সায়ংকালে গৃহে ফিরিয়াছেন, তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন "বাগানের ভিতর দিয়া আসিতেছি আর রজনীগন্ধা ফুলগুলি আমার নাকের কাছে আসিয়া যেন কহিতে লাগিল "শুঁকিয়া দেখ আমার গন্ধ কি চমৎকার।" অমনি ভাবিলাম উদার দাতা ব্রহ্ম ফুল দিয়া বাগান শুধু সাজাইয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। আবার তা মানুষের নাকের কাছে ধরিয়া তার গন্ধ না শোঁকাইয়া সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।" এই বলিতে বলিতে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। দেখিলাম স্বর্গের জ্যোতিঃ সে মুখে।"

একবার সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কাওরাদির কাছারীতে বসিয়া তথা-

কায় শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্যকে বলিতেছিলেন "মেয়েদের বিবাহ দেওয়া যেরূপ কঠিন ব্যাপার তাহাতে তোমাদের মেয়েদের বিবাহের কি উপায় হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।" শুনিয়া আচার্য্য মহাশয়ের মন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইল। কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন—"ওঁর কথায় মন খারাপ কর কেন? সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সকলের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাতে বিশ্বাস রাখ, তাহা হইলে সকল অভাব পূর্ণ হইবে, সকল ভাবনা দূর হইবে।" এইরূপে এমন সাহস দিলেন যে আচার্য্য মহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল, ভয় দূর হইল।

"তিনি সোজা কথায়, সরল ভাষায় ছোট ছোট কাজে আপনার মহত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যে কোন আড়ম্বর ছিল না। অথচ ক্ষণকাল তাঁহার সঙ্গ লাভ করিলে তিনি কি দরের লোক জানিতে বাকী থাকিত না। তিনি ইহলোকেই পরকালোপযোগী জ্ঞানার্জ্জন করিয়া শোক দুঃখের অতীত হইয়া সদানন্দে আপনার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়াছেন। এবং এই জগতের তাবৎ দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ-ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া, মুখে ওঁ ব্রহ্ম এই মহাধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিতেন। অশনে, শয়নে, স্বপনে, রোগে, শোকে এই ব্রহ্মনাম তাঁহার রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু ছিল। বলিতেন, এই ওঁ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণে যেমন পূর্ণভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, পিতা, মাতা বলিয়া ডাকিলে কি প্রাণ তেমন পরিতৃপ্ত হইতে পারে? এমন মধুর ব্রহ্মনাম পাইয়া তাহা ভোগ না করিয়া যদি ধর্ম্মকে আপন আপন ক্ষুদ্র পিতৃত্ব কি মাতৃত্বে আবদ্ধ করিয়া রাখি তবে বৃথা ব্রহ্ম নাম ধরি!"

শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মানুভূতির জীবন্ত পরিচয় তাঁহাতে দেখিয়াছি। ওঁ ব্রহ্ম নাম স্মরণ মাত্র তাঁহার সমস্ত শরীর জাগ্রৎ

ও রোমাঞ্চিত হইত। তাঁহার উপাসনায় কৃতজ্ঞতারই আধিক্য দেখিতাম, যেন সর্ব্বদাই সম্ভোগ করিতেছেন। উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা, সকলই কৃতজ্ঞতার কথায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। মার কোলে শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা আপনাকে ভগবৎক্রোড়ে স্থিত মনে করিতেন। এ নিমিত্ত সর্ব্বদা নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে বাস করিতেন। ব্রহ্মনাম ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। এই ওঁ ব্রহ্ম নাম তাঁহার মোক্ষধাম ছিল।"

স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছিলেন—"অনেক সময় তাঁহাকে ব্রহ্মসত্তায় ডুবিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সময় সময় বলিতে শুনিয়াছি—"কই ব্রহ্ম ছাড়া ত আর কিছু দেখি না। মগ্নাবস্থায় আত্মার একটা গভীর আনন্দ ভোগ থাকে, কিন্তু আত্মা এই অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র দেখে না।" জীবনের শেষ ভাগে দেখিয়াছি আলাপাদিতে অপূর্ব্ব প্রেমের অবস্থার প্রকাশ হইত। ধর্ম্মরাজ্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে আপনার শরীরের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি রাখিতেন না। আপনাকে শিশুর ন্যায় মনে করিতেন। একদিন বলিলেন "আমাকে যে বুড়া কর্ত্তা বলিয়া ডাকে ইহাতে আমার বিরক্তি জন্মে।" ইহার পর সকলে কেবল কর্ত্তা বলিয়া ডাকিত। যিনি আপনাকে ভগবানের কচি খোকা মনে করিতেন, তাঁর আদেশ ইঙ্গিত শুনিয়া জীবনের পথে চলিতেন, তাঁর বার্দ্ধক্য কিরূপে সম্ভব হইবে ?"

"একবার উৎসবে সংকীর্ত্তনাদির পর দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। ব্যাকুলতায় প্রথমে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে কান্নার পরিবর্ত্তে তাঁহার বদনমণ্ডলে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমারও হৃদয় স্পর্শ করিল।

"বৃদ্ধের সঙ্গে বৃদ্ধের ভাবে, যুবকের সঙ্গে যুবকের ন্যায় উৎসাহে এবং

শিশুর সঙ্গে শিশুভাবে তাঁহাকে মিশিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গ লাভে কি যে আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। এই ঋষিকল্প মহাপুরুষের নিষ্ঠার কথা স্মরণ করিলে আজও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।"

"বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্র সিভিল সার্জ্জন প্যারীমোহন গুপ্তের অকাল মৃত্যু হয়, তখন তিনি মৃত দেহের পার্শ্বে শান্তচিত্তে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ওঁ ব্রহ্ম ধ্বনি করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন;— "হে প্রাণারাম, তুমি যে দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে, এজন্ত কৃতজ্ঞতাভরে তোমাকে প্রণাম করিতেছি।" নিকটে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা পুত্রশোকে তাঁহাকে এমন অবিচলিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "যদি মহাপুরুষ কেহ থাকেন, যদি ধার্ম্মিক বিশ্বাসী নামের যোগ্য কেহ হন, তবে আমাদের এই রায় মহাশয়।" যাঁহারা তাঁহাকে সে সময়ে স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহারা দূরে থাকিয়া মনে করিয়াছেন, "এত বড় শোক এ বয়সে কেমন করিয়া সহ্য করিবেন।" কিন্তু সাক্ষাতে আসিয়া দেখিয়াছেন কি প্রসন্ন মূর্ত্তি। তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত এক স্বর্গীয় আভা বিরাজ করিত।"

"যখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তিনি দিন-মান তাঁহার শিয়রে বসিয়া আনন্দময় মঙ্গলময় এই নাম তাঁহার কর্ণে শুনাইতেছিলেন। নাম শুনাইতে শুনাইতে যখন এক একবার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল, অমনি উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ব্রহ্ম বলিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া লইতেছিলেন। যখন পত্নীর দেহত্যাগ হইল তখন মৃতদেহ কুসুমে সজ্জিত করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এবং এত দিনের জীবনসঙ্গিনীকে গভীর নিশীথে

চিতারোহণ করাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কেবল এই বলিলেন "আজ আমার যুগান্তর উপস্থিত। তিপ্পান্ন বৎসর কাল একভাবে জীবন চলিয়াছিল। আজ ব্রহ্মের ইচ্ছায় অন্যরূপ হইল।";

তখন তাঁহার মুখে হা হুতাশ ছিল না, কেবল মাঝে মাঝে ওঁ ব্রহ্ম নাম শুনা যাইতেছিল। প্রভাতে শোকাচ্ছন্ন সন্তানদিগকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন শোকে এত কাতর হইয়াছ? জান না কি এতদিন তোমাদের মা দেহে আবদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত তোমাদের কাছে যাতায়াত করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদা তোমাদের চিন্তায় ব্যাকুল হইতেন, তাহাতে রোগ-যন্ত্রণায় কত কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। আর আজ দেখ তিনি অশরীরী হইয়া সম্পূর্ণ ষোলআনা ভাবে তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তবে আর তোমাদের দুঃখ কিসের বল?" ব্রহ্মপ্রেমিক পিতার মুখে এইরূপ সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া সন্তানগণের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

তাঁহার এইরূপ শোকে সান্ত্বনার মূল কোথায় তাঁহার লিখিত কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে,—

"ধন জন নিয়ে আশা অসারতাময়,
ধনে আশা, জনে আশা, অসারেই হয়।

বুঝাইতে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে,
ধীরে ধীরে গুরুতর শোকাবর্ত্ত গড়ে।

বার শ দুইয়েতে মাতা, তিনে যায় জায়া,
চারি সনে পুত্রবধূ স্বপনের ছায়া।

পাঁচ সনে প্যারী-ধনে হইলাম হারা,
জানি না (আর) কিসে হবে চক্ষুদান করা।

এক পুত্রবধূ আগে চলিয়া গিয়াছে,
আর এক পুত্রবধূ বিধবা হয়েছে।
অপোগণ্ড শিশুগণ আছে যার কোলে,
জানি না যে ভগবান কি ভাবেতে পালে।
যে ভাবনা কখনো' না ধরিত আমায়,
এখন ঘিরিছে দেখি সেই ভাবনায়।
আমি চাই বন্ধনের ছাড়াম উপায়,
পাকে পড়ি ছাড়া বন্ধন আমারে জড়ায়।
ওহে মম প্রাণ-ব্রহ্ম, প্রাণের আরাম,
ছাড়া ধরা ছাড়াইয়া দেও ব্রহ্মনাম।
নহিলে ছাড়িতে কষ্ট, ধর্ম্মে হই সুখী,
সুখে দুঃখে অন্ধকার, কিছুই না দেখি।"

"একবার তাঁহার উরুতে একটি বৃহৎ ফোড়া হয়। তখন তিনি একাকী কাওরাদি কাছারীতে ছিলেন। চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া, ঢাকায় আসিলেন। তখন রোগের যাতনায় তাঁহার মুখে কালিমা পড়িয়াছিল, কিন্তু অধৈর্য্যের কোন লক্ষণ ছিল না। বিষম বেদনার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল ঘন ঘন 'ওঁ ব্রহ্ম' বলিতেন, তাহাতেই যেন বেদনার উপশম হইত। চিকিৎসক আসিয়া কাটিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। ডাক্তারকে বলিলেন "আমাকে না জানাইয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিবেন না। ভয় নাই, আমি আপনাদের কাজে বাধা দিব না, ঔষধ দিয়া আমাকে অজ্ঞান করার আবশ্যক নাই। কেবল অস্ত্রাঘাতের পূর্ব্বে আমি একটু ভগবানের নাম করিতে চাই। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন "আপনি প্রস্তুত হউন ," অমনি তিনি বক্ষে দুই হস্ত রাখিয়া গম্ভীরভাবে

সর্ব্বসন্তাপহারী ওঁ ব্রহ্ম নাম তিনবার উচ্চারণ করিয়া ডাক্তারকে অস্ত্র করিতে অনুমতি করিলেন। চিকিৎসক তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া দেখেন তাঁহার শরীর নিস্পন্দ। তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন মনে করিয়া ডাকিলেন ও সাড়া পাইলেন। তিনি বলিলেন "কোন কষ্ট পাই নাই।" তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন "আজ কালকার দিনে এমন বিশ্বাসী লোক আছেন, আমার এমন ধারণা ছিল না।"

ইহার পর অচিরাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে আরও অনেকবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু কখনও মৃত্যু-ভয়ে তাঁহাকে ম্লান দেখা যায় নাই।

দ্বিতীয়বারের বিবাহে তাঁহার সম্মতি ছিল না। ইহা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার কোন কন্যার বিবাহ দ্বিপত্নীকের সঙ্গে স্থির হয়। এই কন্যার বিবাহে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কন্যার প্রতি গভীর স্নেহ সত্ত্বেও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্যে যোগ দেন নাই। বিবাহ স্থির হইলে কন্যাকে বলিলেন, "মা গো, অন্তরের বিরুদ্ধ মত লইয়া আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তুমি মনে দুঃখ করিও না।" বিবাহের পরে কন্যাকে লিখিলেন "মাগো, এতদিন সংসারের কোন ভয় জানিতে পার নাই, এখন ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই ভয় বহন করিতে তোমার মন চলিল, জীবন চলিল; ইহার কারণ? তোমার মনকে কে চালাইল? তোমার জীবনে এই মহৎ ও পবিত্র ব্রত ধারণ করিতে কে শিক্ষা দিল? চাহিয়া দেখ, ইহার মূলে সেই ভগবান বিনা আর কারণ নাই। অতএব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও এবং চক্ষে দেখিও এই সংসারব্রত ও পতিব্রত অনুষ্ঠানে তিনি হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। অতএব সমুদয় ভার তাঁহার হস্তে

দান করিয়া, আপনি তাঁহার দাসী হইয়া, তিনি যে পথে লইয়া যাইবেন বা যে কার্য্য করিতে বলিবেন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইবে। তাহাতে দুঃখ বা বিপদের যে একটা কাল্পনিক আঘাত তাহা টের পাইবে না। যেমন এখন তোমার মা মুরব্বি আছেন, তাঁহার অভিপ্রায় সাধন করিয়া সকল কর্ম্ম কর, এইরূপ সর্ব্বদা ঈশ্বরের অভিপ্রায়মত সকল কার্য্য করিও। ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত বলে। এই ব্রত যে নরনারী সমুদয় জীবন ভরিয়া প্রতিপালন করে, তাহারই মানবজন্ম সফল হইল। মা গো, ইহাও মনে রাখিও, কেবল যে অতিথিসৎকার বা দান কি উপাসনা, সত্যাচরণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যেই ধর্ম্ম পড়িয়া আছে তাহা নয়। এক সময় একখানি কন্থা সিলাই করাও ধর্ম্ম; পাক পরিবেশন করিয়া পরিজন বন্ধু বান্ধব-দিগকে পান ভোজন করানও ধর্ম্ম। ঘর লেপন, ঘর ঝাট দেওয়াও ধর্ম্ম। এইরূপ যখনকার যে কর্ম্ম তাহা করাই ধর্ম্ম। এই কয়েকটি সংসারকার্য্য, ইহাতে ধর্ম্ম নাই, আর এই কয়েকটী ধর্ম্মকার্য্য, এমন নয়।"

তাঁহার একটি গানে আছে "নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে।" নামসাধনের বলে তিনি স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহমন জড়তা প্রাপ্ত হয় নাই, বরং যুবা প্রাণের উদ্যমে জীবনের সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তিনি ১৩০৪ সনে মাঘোৎসবের পর কাওরাদি হইতে সদলে প্রচার যাত্রা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ২০দিন পরে পুনরায় কাওরাদি ফিরিয়া আসেন। তিন সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিন কীর্ত্তন, আলোচনা, উপাসনাতে যাপন

করেন। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধের এই রূপ যৌবনোচিত উৎসাহ ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই হইতে পারে না।

তিনি যখনই সদলে প্রচারযাত্রা করিতেন, সকলের ব্যয় নিজে দিতেন। মণ্ডলীর লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়কে তিনি সার্থক জ্ঞান করিতেন। এইরূপ প্রীতি ও হিতৈষণা দ্বারাই তিনি তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে একটি সুন্দর ধর্মস্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"একবার তিনি পীড়িত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইতে বাধ্য হন। তাঁহার সঙ্গে একজন পুরাতন ভৃত্য গমন করিয়াছিল। তথায় এই ভৃত্যের কঠিন পীড়া হয়। গুপ্ত মহাশয় ভৃত্যের বিপদে অধীর হন, অশ্রুপাত করিতে থাকেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহার এই অস্থিরতা দেখিয়া ভীত হইলে, তিনি বলিলেন "আমার এই গুণের চাকর এতকাল আমার আরামে ব্যারামে কত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, আর আজ সে নিজে অক্ষম হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে, আমি এ সময় তার কিছুই করিতে পারিতেছি না, এ দুঃখ আমার অসহ্য বোধ হইতেছে।" ভৃত্যের প্রতি এমন সমবেদনা কয়জনে বোধ করিয়া থাকেন? একবার গ্রামের এক নফর পাগল হইয়া নানা অত্যাচার করায়, গ্রামের লোক একত্র হইয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া একঘরে করে। সেই অবধি তিনি এই ব্যক্তির পরিবারস্থ সকলের সহায় হন। এবং ইহার পাগলামি দূর হইলে ইহাকে এবং ইহার সন্তান সন্ততিকে আপনার পরিবারের দাস দাসী করিয়া রাখেন। গ্রামে বাস করিলে শেষকালে ইহার মৃতদেহের কোন গতি না হয়, এজন্য ইহাকে আপনার কাছে আনেন। এবং অন্তিম-কাল পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করেন। অবশেষে ইহার মৃত্যু হইলে

সৎকারের সমস্ত আয়োজন, ও স্বহস্তে মৃতশব স্নান করাইয়া শুভ্র বস্ত্রে আবৃত করেন। তাঁহার সেই সময়ের ব্যবহার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, "এতবড় লোক হইয়া এই সামান্ত নফরের এই কাজ তিনি নিজের হাতে করিলেন ? তাঁর ধর্ম্মের বলিহারী যাই"—পরে তিনি সেই শব সাজাইয়া স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া দগ্ধ করিলেন। বৃদ্ধ শরীরে এইরূপ পরিশ্রমে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বরং নিষেধ করিলে বলিলেন "তোমরা মনে করিয়াছ সামান্ত নফরের মৃতদেহ বহন করিয়া অকারণ কষ্ট পাইতেছি। কিন্তু তোমরা জান না সে আমার কি উপকারী জন ছিল। ইহার শেষ কাজ আমার কর্ত্তব্য কাজ। ইহার দেহের সদ্‌গতি করিতে পারিলে আমি প্রাণে বড় শান্তি পাইব। সুতরাং ইহাতে তোমরা আমাকে বাধা দিও না।"

একবার কোন মুসলমান ফকিরের গৃহে আহূত হইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি পেগাম্বরের নামে মানত বাতাসা আনিয়া ফকিরের সম্মুখে রাখিল। ঐ ফকির উক্ত বাতাসা গুপ্ত মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিল "ইনি পেগাম্বর অপেক্ষা কম নহেন। খোদার আশীর্ব্বাদে আমরা এমন সাধুর দেখা পাইয়াছি। আমরা মানুষ চিনি না, তাই ইঁহাকে সামান্ত মনে করি। কিন্তু ইনি সামান্ত লোক নহেন।" সাধারণের মধ্যে এইরূপ প্রভাব বিস্তার শুধু কথায় হয় না। সত্য জীবন দেখিলেই মানুষ এমন আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ তাঁহাকে বড়লোক আখ্যা দিলে তিনি তাঁহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না। একবার কাওরাদি হইতে অন্যত্র যাইতে পথে খুব পরিশ্রান্ত হন। এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রামকালে শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্য তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কথায় কথায় বলিলেন "আপনি বড়লোক এবং বৃদ্ধ, তাই একটু পথ চলিতেই ক্লান্ত হইয়াছেন।" শুনিয়া

বলিলেন "আমাকে বাতাস করিও না, আমি 'বড় লোক' আখ্যা লইতে চাহি না।"

তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে তাঁহার জন্য একটি সুন্দর গৃহ এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তিনি তথায় আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বচ্ছন্দতা ইচ্ছা করিতেন না, বলিতেন "আমি কি পাটের শিব হইয়া থাকিতে পারি? কলিকাতায় আমার কত বন্ধু বান্ধব, তথায় আমার কত কাজ! আমার কি আরাম ভাল লাগে?"

যৌবনে কালীনারায়ণের ধর্ম্মদৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তিনি কিরূপ উপভোগ করিতেন তাহার উল্লেখ করিতেছি;—তিনি একবার তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসকে সঙ্গে লইয়া কেন্দুয়ার খাল দিয়া ভাটপাড়া হইতে ঢাকা আসিতেছিলেন। খালের দুই তীরে ঘননিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষের শাখাসকল দুই দিক হইতে আসিয়া খালের উপর পতিত হওয়ায় সূর্য্যচন্দ্রের আলোকপ্রবেশের পথ বন্ধ ছিল। তাঁহারা পূর্ণিমা রাত্রিতে যাইতেছিলেন, তবু অন্ধকার ভিন্ন আলোক ছিল না। পরে তাঁহাদের নৌকা শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়িলে, হঠাৎ তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে প্রবেশ করিলেন। প্রেমিক কালীনারায়ণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ প্রসন্ন, নরক আর স্বর্গ এইরূপ। এতক্ষণ আমরা অন্ধকার পথে ছিলাম, স্ফূর্ত্তি আনন্দ কিছুই ছিল না। এখন আপনা হইতে হৃদয়ে আনন্দ স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়াছে। নরক অন্ধকারময়, আনন্দ স্ফূর্ত্তিহীন, আর স্বর্গ আলোকময়, আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। বিবেক উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রখর হইলেই স্বর্গে বাস, তখন প্রাণে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ, আর আনন্দ ও

স্ফূর্ত্তি! আর তাহার অভাবেই পাপ, অন্ধকার, নিরাশা। তখনই যথার্থ নরক, নতুবা আর স্বর্গ নরক কি?"

প্রকৃতির নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য দর্শনে কিরূপ আত্মহারা হইতেন তাহার উল্লেখ করিতেছি;—"একদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইলেন এবং অনুসন্ধানে লোক বাহির হইল। অনেক অনুসন্ধানে দেখা গেল, তিনি দূরে এক শ্মশানে ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন। সমস্ত রজনী তাঁহার সেই শ্মশানক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে প্রসন্নমনে গৃহে আসিলেন। পত্নী তাঁহার অপেক্ষায় গৃহদ্বারে ছিলেন, দেখিয়া বলিলেন "রাত্রি যাপন কোথায় হইল?" বলিলেন "ভগবান যেখানে ডাকিয়া নিলেন সেখানে গেলাম।" পত্নী বলিলেন "বলিয়া গেলে ত আর এত দুর্ভাবনা ভুগিতে হইত না।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "বলিবার অবসর পাইলাম কৈ? হাটিতে হাটিতে কখন যে গিয়া একেবারে শ্মশানে পড়িলাম তা নিজেই জানিতাম না। চারিদিকের শোভা দেখিয়া প্রাণটা ভরিয়া গেল, বসিয়া পড়িলাম। আর উঠিতে পারিলাম না। তাই সময়ের জ্ঞান ছিল না। কত কি চিন্তায় মনটাকে উদাস করিয়া ফেলিল।"

কিরূপ বিনয়ী ছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি। "একদা তাঁহার কন্যাসমা কোন ভদ্রমহিলা সাধু-সেবা করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী গৃহে আহারের আয়োজন করিতে নিরস্ত রহিলেন। কিন্তু আহারের সময় উপস্থিত হইলে তিনি স্বহস্তে আসন পাতিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন ব্যঞ্জন আনিতে আদেশ করিলেন। শুনিয়া পত্নী বলিলেন "আজ বুঝি নিমন্ত্রণের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? আমি ত নিরামিষ কিছুই রাঁধিতে দেই নাই। কি দিয়ে খাবে?" তিনি বলিলেন "ডাল

ভাত আছে ত? এক আধ ছিটা দুধও কি আর না দিবে? তা হ'লেই যথেষ্ট। আমি নিমন্ত্রণের কথা ভুলি নাই। তুমি কি মনে করিয়াছিলে সাধু নাম কপালে দাগিয়া কারো পুণ্যের ভাগি ভরিতে গিয়া চিরদিনের মত নিজের কাছে আহম্মক বনিব? সেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হইলে বলিব "মা, আমি কি তোর একটা পাগলা ছেলে যে, লজ্জা সরমে রমাথা খাইয়া মায়ের কাছ থেকে সাধু-সেবা লইব?" তাঁহার পত্নী স্বামীর মুখে এই সব কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।"

বিনয়ী অথচ স্বীয় মতে কিরূপ দৃঢ় ছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি;—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পরিবর্ত্তন হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণের পারিবারিক অর্চ্চনাদিতে অনেকে তাঁহাকেই আচার্য্য মনোনীত করিতেন। গুপ্তমহাশয়ের গোস্বামীমহাশয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও পুত্রের বিবাহে গোস্বামীমহাশয়কে মনোনীত না করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়কে আচার্য মনোনীত করিয়াছিলেন! গোস্বামী-মহাশয় বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গুপ্তমহাশয় গোঁসাইকে বলিলেন "আপনি ত আর এখন ব্রাহ্ম নন, সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ই আচার্য্যের কার্য্য করিবেন।" মুখে ও মনে তিনি সর্ব্বদা একভাবে চলিতেন। কাজেও মনের অনুরূপ ব্যবহার ছিল।

উৎসব আনন্দের ব্যাপার। সেই ব্যাপারে অশ্রু, হা হুতাশ দেখিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। একবার মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে চারিদিকে ক্রন্দন শুনিয়া এমন ব্যথিত হইলেন যে, "আনন্দে আনন্দময় নিরানন্দ নাই এ ঘরে" এই গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে সময়োপযোগী গান শুনিয়া অনেকের হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। উৎসবে আর্ত্তনাদ শুনিলে বলিতেন, "এমন

দিনে যদি কাঁদ্‌ব তবে হাস্‌ব কবে? ঈশ্বর যেন একটা পাপ-ধোয়ার কল। সম্বৎসরকাল ভরিয়া যত না কেন পাপ করি, এই মাঘোৎসবদিনে আসিয়া কাঁদিয়া এই কলতলায় মাথা দিলেই যেন সব ধুইয়া যাইবে। এ কি মনের বুঝ আমিত বুঝিতে পারি না।"

তাঁহার ধর্ম্মসাধনে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা ছিল না। হাসি, গল্প, আমোদ, আহ্লাদ ইত্যাদি দিবসের সকল ব্যাপারের মধ্যেও তিনি তাঁহার প্রাণব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাইতেন। শিশুর কাছে শিশু, যুবার কাছে যুবা, আবার বৃদ্ধের কাছে বৃদ্ধ হইতেন। ছোট ছোট বালক বালিকারা যখন আনন্দে খেলা করিত, তখন তাহাদের সেই হাসিভরা মুখেও সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশল দর্শন করিতেন। এবং ওঁ ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের খেলায় যোগ দিতেন।

কিরূপ ক্ষমাশীল ও উদারচিত্ত ছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি;—একদিন তাঁহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া তাঁহার কন্যা পরলোকগতা বিমলা দাস কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"মা, আমি আজ এক মহাভাবনায় পড়িয়াছি। আমার এক পরম স্নেহভাজন আমাকে আজ একখানা চিঠি লিখিয়াছে, তাহা পড়িয়া কেবল বারবার মনে হইতেছে বাছার বুঝি মাথায় কিছু গোল হইয়াছে। নতুবা এমন চিঠি সে কখনও আমাকে লিখ্‌ত না। সে পাছে পাগল হয়, এ ভাবনায় আমি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।" অপর লোক সে চিঠিখানি পড়িলে রাগে অন্ধ হইয়া হয়ত তার বেয়াদবীর উচিত শাস্তি বিধান করিত। কিন্তু তিনি স্নেহপরবশ হইয়া কেবল অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন। তাঁহার এইরূপ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, তিনি নশ্বর দেহে আবদ্ধ হইয়াও স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেন।"

"অপর একদিন তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাকে বহু তিরস্কার করিয়া একখানি চিঠি লেখেন। কোন দরিদ্রের কন্তার সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, ইহাই তাঁহার বিরাগের কারণ। চিঠিখানি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আজ অমুক পেট ভরিয়া খাইবেন, কেননা রাগে দুঃখে এতদিন তাঁর হজমের নিশ্চয়ই গোলমাল হইতেছিল। আজ তিনি সকল রাগ সকল দুঃখ প্রাণ থেকে উজার করে আমাকে ঢালিয়া দিয়াছেন। আর এখন কোন ভাবনা নাই, নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া করবেন, মনে করতে আমার ভারি খুসী লাগতেছে, তাই আর না হাসিয়া পারতেছি না।"

তিনি কিরূপ ক্ষমাশীল মহাপুরুষ ছিলেন, এ ঘটনায় তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ যে শুধু ক্ষমা তা নয়, ক্ষমায় আত্মহারা হইয়া অবমাননাকে আনন্দের ব্যাপার করিয়া তোলা। এই যে অবমাননাকে অগ্রাহ্য করা ও রাগের সঙ্গে অনুরাগ মিশাইয়া দেওয়া ইহাতেই মানব-চরিত্রের যথার্থ গৌরব। মানবাত্মা যে সাক্ষাৎ ভাবে পরমাত্মার পরিচয় অল্পাধিক পরিমাণে দিতে সমর্থ, এ সকল ঘটনাদ্বারা সেই শিক্ষা-লাভ হয়।

অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল, তন্মধ্যে শিল্প একটি। রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও তিনি শিল্পে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যৌবনে যখন হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল, তখন কোন ব্যবসায়ী কারিকর দ্বারা প্রতিমা না গড়াইয়া স্বহস্তে গড়াইতেন। এবং ব্রাহ্মণদ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা অর্চনা করিতেন। বিনা শিক্ষাতে কিরূপে এই সকল সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গড়েন, তাহা দেখিবার জন্ত গ্রামের লোক তাঁহার গৃহে একত্র হইত, এবং তাঁহার প্রশংসা

করিত। পরে যখন পৌত্তলিকতাবর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমানির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিলেন তখন অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া আপন মনে কত চিত্র অঙ্কিত, কত মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ সুসজ্জিত করিতেন। সামান্য কাগজ কাটিয়া ঝাড় লণ্ঠন তৈয়ার করিতেন, চা খড়ি খুদিয়া কখনও খৃষ্ট মেরীর, কখনও কোন বাজীকরের, যখন যাহা ইচ্ছা অবিকল প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিতেন। সময় সময় মৌচাকের মোম কি মোম-বাতি দিয়া টিকটিকি বানাইয়া দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিতেন, দেখিয়া কত লোক সত্য বলিয়া ভ্রম করিত। এ সকল নির্ম্মাণের যন্ত্রের মধ্যে হয়ত একখানা কলম কাটিবার ছুরি, নয়ত একখানা ভোঁতা কাঁচি, এই তাঁহার সম্বল ছিল। কি সামান্য জিনিষ দিয়া কি তৈয়ার করিতেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। তাই অতি তুচ্ছ জিনিষও যত্নে বাক্সে পূরিয়া রাখিয়া বলিতেন "তৃণ হ'তে কার্য্য আসে যদি যত্নে রাখে"। কাওরাদি কাছারীঘর, ব্রহ্মমন্দির তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের সুন্দর নিদর্শন। ঐ গৃহ এবং মন্দিরে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম তাঁহারই অভিপ্রায় ও পরামর্শে নির্ম্মিত হয়। কাছারীঘর তিনি তাঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত বিবধ চিত্র ও পুত্তলি দ্বারা সুন্দর সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহা দেখিবার জন্য দূরস্থ লোকেরাও অনেক সময় আসিত। প্রজারা তাঁহার এই সুসজ্জিত গৃহকে রঙ্গমহলী নাম দিয়াছিল।

একবার কাওরাদি কাছারীতে লোক দ্বারা কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান; উহাতে একটি কাবুলী মাতা শিশুকে স্তন পান করাইতেছে, গাভী বৎসকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, এরূপ ছিল। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে এমন স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল যে, দর্শক মাত্রই মুগ্ধ হইত। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ আদর এই ভাবের প্রতি তাঁহার বিশেষ ছিল। উহাকে তিনি 'সোহাগ' নামে অভিহিত করিতেন।

পৃথিবীর মার সোহাগে জগজ্জননীর সোহাগের কথাই তাঁহার মনে উঠিত। এ নিমিত্ত যেমন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, তেমনি চিত্রের ভিতর দিয়া, মার সোহাগের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

কেবল শিল্পে নয়, সঙ্গীত বাদ্যেও তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। গ্রামে যাত্রার দলে বেহালা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া নিজে অল্প দিনের চেষ্টায় এমন বেহালা শিক্ষা করেন যে, সুদক্ষ বাদকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে বেহালা ধরিতে লজ্জা বোধ করিত। তিনি শুধু আপনার চেষ্টায় এস্রাজ, সেতার, মৃদঙ্গ, বাঁয়া, তবলা ইত্যাদি সকল বাদ্য যন্ত্রে অসামান্য অধিকার লাভ করেন। যখন তানপুরা লইয়া তালমান সহ ব্রহ্মগুণ গান করিতেন, তখন মর্ত্ত্যধামে এক দৈব শক্তির আবির্ভাব হইত। আবার যখন মৃদঙ্গগলায় কীর্ত্তনে ঘরের বাহির হইতেন, আনন্দে উৎসাহে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লইত।

একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুমধুর বালিকাকণ্ঠে "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম, আননে" এই গান শুনিতে পাইলেন। তখন দাঁড়াইয়া করযোড়ে মহর্ষিকে বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আপনার আলাপে আমি মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না; যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই গানটি কাছে গিয়া শুনিতে অনুমতি করেন, তবে বড় বাধিত হই।" মহর্ষি তাঁহাকে সাদরে অন্তঃপুরে যেখানে সেই বালিকা বসিয়া গান করিতেছিল, সেখানে লইয়া গেলেন। যতক্ষণ তিনি সেই গানটি শুনিতেছিলেন ততক্ষণ তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা পড়িতেছিল।"

কেবল ব্রহ্মসঙ্গীত নয়, যিনি যে ভাবে আপনার কার্য্যদ্বারা

আত্মার ব্রহ্মত্বকে যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত করিতে সক্ষম হইতেন তিনি সেখানেই ভাবে আত্মহারা হইয়া আপনার প্রাণব্রহ্মের সহবাস সম্ভোগ করিতেন।

তিনি তাঁহার অনুগত লোকদিগকে এত ভালবাসিতেন যে তাহাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হইত। তাহারা তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিতে পারিত না।

গণেশ তাঁহার একজন অনুগত লোক। একবার গণেশ পুরুলিয়া গমন করে। যাওয়ার সময় গুপ্ত মহাশয়কে বলিল "কর্ত্তা, দূরে যাইতেছি। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কখন চলিয়া যান। মৃত্যুকালে পাছে দেখা না হয়, এই ভাবনায় মন বড় অস্থির হইতেছে।" তিনি বলিলেন "ভগবানের ইচ্ছা হইলে দেখা হইবে, চিন্তা করিস্ না।" ইহার কয়েক মাস পরে একদিন হঠাৎ গণেশের মন তাহার কর্ত্তার নিকট যাইতে ব্যস্ত হইল। সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া গণেশ কাওরাদি যাত্রা করিল। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় ভাটপাড়ায় রোগশয্যায় কাতর ছিলেন। গণেশ কাওরাদি হইতে ভাটপাড়া গিয়া গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। ইহার অল্পদিন পরেই গুপ্ত মহাশয় দেহত্যাগ করেন। সেই সময় না আসিলে গণেশের সঙ্গে আর তাঁহার দেখা হইত না।

তিনি ভাটপাড়ার বাড়ীতে রুগ্নশয্যায় অত্যন্ত কাতর। এই অবস্থায় শোকের সংবাদ সহ একখানি পত্র আসিল, তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শোকে দাতা ব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছেন, অমনি মেদিনী ভীষণ ভূকম্পে কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য চারিদিক হইতে চীৎকার আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অশক্ত ছিল, কেবল অতি কষ্টে উঠানে আসিলেন, নিরাপদ

স্থানে যাইতে পারিলেন না। একটি ভৃত্য দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া সরাইল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই দালান ভাঙ্গিয়া তথায় ইটগুলি পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলেই তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইত। ঈশ্বরকৃপায় বাঁচিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতাভরে ভক্তের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি দাতা ব্রহ্মকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সেই সময়ের কৃতজ্ঞতার স্মৃতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"আহা কি গো প্রাণ-ব্রহ্ম মর্ম্মের আধার,
মর্ম্মকথা ব্যথা যত বিদিত তোমার।
আরামে আরামে বুঝি ঘুম পেয়েছিল,
তাই বিধি বিধিমতে চৈতন্য করাল ॥"

অনুগতদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাঁহার লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা ১৩০৭ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত হৃদয় আচার্য্যকে লেখেন ;—"তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই কাছার হইতে আসিতে রাস্তায় তোমার পিতৃদেবের লোকান্তর-বার্ত্তা জানিয়াছিলাম। বিশেষতঃ তোমার মাতৃদেবীর লোকান্তর-বার্ত্তা জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ঈশ্বরের নাম প্রেম ধন্য যে, এই উপলক্ষে তুমি ব্রহ্মোৎসব করিতে প্রস্তুত হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছ। ব্রাহ্মসমাজ শ্রাদ্ধেতে উৎসব ভোগ করিবে, তবে মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইবে। অমৃতের যাত্রী হইয়া যদি অমৃত না ভাবিতে পারিলাম, তবে অমৃত কৈ? অনেকের পিতৃমাতৃ-উৎসব এককালে ঘটে না। প্রাণারাম পূর্ণব্রহ্ম এই মৃত্যুতে অমৃতদ্বারা যে তোমাকে অভয় দিতেছেন, এই ভাবিয়া বড় সুখী হৈ। পৃথিবীতে যেমন ব্রহ্মোৎসব, এমন দিনে দিনে মাতৃপিতৃ-উৎসব ভোগ করিয়া ইহপর ভাবে এক হইয়া পরম সুখী হইবার জন্য যাহা বিতরণ করিয়াছেন, তাহাকে অন-

উৎসব ভাবে কেন ভোগিব? শ্রাদ্ধের দেহত্যাগ অবধি যদি আরম্ভ ধরা যায় তাহা হইলেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শ্রাদ্ধেতেই থাকিতে হয়। যে শ্রাদ্ধের শেষ হয়, ব্রাহ্মেরা সেই শ্রাদ্ধ করে না। দেহ-ত্যাগ হইতে শ্রাদ্ধের আরম্ভ হয়। অনন্তকাল ভরিয়া ইহলোকে পরলোকে অনন্তলোকে ইহা ব্যাপ্ত আছে, ও থাকিবে; ইহার বিরাম নাই। যাহারা এই শ্রাদ্ধ বর্ত্তমান রাখিতে চায়, তাহারাই সৎ পুত্র কন্তা।

আজ স্মরণার্থ এই করি সেই করি, জীবনচরিত লিখি, ফটো রাখি, চিত্র রাখি, পাথরের ছবি রাখি, যাহাতে মরণোত্তর অধিক দিন জাগ্রত থাকেন, তাহারই চেষ্টা করি। এই শ্রাদ্ধে এই চেষ্টা আমার কোন কালে যে ছুটিবে জানি না। সুতরাং শ্রাদ্ধ অশেষ, চিরস্থায়ী। অতএব পিতৃস্মরণে যেদিন উৎসব সেদিন পিতৃউৎসব; এরূপ মাতৃ-উৎসব, ভ্রাতৃউৎসব, পুত্রোৎসব ইত্যাদি উৎসবময় হইয়া ইহপর উৎসবে পূর্ণ করিবে। মঙ্গলময়ের সর্ব্বমঙ্গলতা পূর্ণ হইয়া অমৃত প্রকাশ পাইবে, ইহাই মঙ্গল, ইহাই শুভ। তাই প্রাণের যোগ রহিল।

এ অবস্থায়, এই বয়সে শারীরিক যোগ দিতে পারিলাম না। তোমার সাধু সাধ্বী পিতা মাতার এখন মুক্ত অবস্থা। তাই তাঁহাদিগকে এখানেই পাইব, এই আশা। তনের যোগ সেখানে গেলেও হবে না। মনের যোগ সেখানে যেমন এখানেও তেমন। অতএব বৎস, কিছু মনে করিও না।

বয়সে বোধ হয় সমান ছিলাম। আমার এখন ৭০ চলিতেছে। তোমার পিতৃদেব বোধ হয় একাধিক বৎসরের বেশী কি কম হইবে।

আশীর্ব্বাদক শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র,—

"ঠিক কোন্ সময়ে কি ভাবে ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের

সহিত আমার প্রথম পরিচয় ও আলাপ হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই, তাঁহার সকল কথাও স্মরণ নাই; বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে যে যে উক্তি স্মরণ আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একবার আমি ঢাকাতে গেলে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার জমিদারী কাওরাদিতে যাইবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। তৎপর দিন সন্ধ্যার সময় চারিদিকের গ্রাম হইতে কতকগুলি শ্রমজীবী ও কৃষক সমবেত হইল। গুপ্তমহাশয় তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালাপ ও সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে বসিলেন। তাহার মধ্যে এমনি মত্ততা আসিল যে, কোথা দিয়া সময় যাইতে লাগিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। ক্রমে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। আমি গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গেলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখি তাঁহাদের গান চলিতেছে। গুপ্ত মহাশয় তাহাদের মধ্যে আসীন আছেন; এবং ভাবাবেশে ও প্রেমাশ্রুপাতে তাঁহার দুই চক্ষু অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন "আপনি চলিয়া যাওয়ার পর আমাদের গান আরো জমেছিল; কি আনন্দই পেয়েছি বাক্যে বর্ণন করিতে পারি না।"

আর একবার আমি ও গুপ্ত মহাশয় দুই জনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে যাইতেছিলাম; পথিমধ্যে দেখিলাম একটি গাভী ও তাহার বাছুর পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বাছুরটি তাহার মাতার স্তন পান করিতেছে। গুপ্ত মহাশয় তাহাদের দিকে চাহিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন। তৎপরে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইল তাহা এই;—

আমি—ও কি গুপ্তমহাশয়, দাঁড়ালেন যে?

গুপ্তমহাশয়—বাছুরটি লেজ নাড়ছে, কারণ, সে দুধ পাচ্ছে; আচ্ছা, বলুন দেখি, গরুটা কেন লেজ নাড়ছে?

আমি—ওদের স্বভাব ও অভ্যাস লেজ নাড়া, এতে আবার আশ্চর্য্য কি?

গুপ্তমহাশয়—বাছুর পেয়ে সুখী, গাভী দিয়ে সুখী। এইরূপ আমরা পেয়ে সুখী, ভগবান দিয়ে সুখী।

আমি।—ঠিক! ঠিক! ভক্ত মানুষ না হ'লে এ বোধ কে পায়?

আর একবার আমি তাঁহার এক দৌহিত্রীর বিবাহে আচার্য্যের কাজ করিবার জন্য শ্রীহট্ট জেলার এক সহরে যাই। সেখানে অবস্থান-কালে একদিন প্রাতে আমরা কয়েকজন একত্রে বসিয়া আছি, আমাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেছেন। ইতি মধ্যে আমি গায়ককে বলিলাম "ওহে, আমি ইংলণ্ডে অবস্থানকালে মানসিক অবসাদের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়াছিলাম, সেটা লিখিয়া দিতেছি, তুমি সুর দিয়া গাইয়া শোনাও ত। এই বলিয়া গানটী লিখিয়া দিলাম। সে গানটী এই ;—

জান্‌লাম না মা বুঝ্‌লাম না মা,
　　এ তোর রীতি কেমনধারা।
থাক থাক লুকাও কোথায়,
　　ক'রে আমায় দিশেহারা।
আমি আঁচল ধরা ছেলে,
যেতে হয় কি একলা ফেলে,
মায়ের মুখ না দেখ্‌তে পেলে,
ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।

যদি বল, কি গুণ আছে,
বাঁধা রবে আমার কাছে,
তুমি আপনার গুণে আপনি বাঁধা
ও আমার মা চমৎকারা।"

গানটী শুনিয়া সমবেত বন্ধুগণের সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গুপ্তমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, তাঁহার মুখে তেমন আনন্দের কিছু নাই। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "গুপ্তমহাশয়, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে গানটা আপনার ভাল লাগ্‌ল না।"

গুপ্তমহাশয় বলিলেন "আপনি ও কি বল্লেন! 'থাক থাক লুকাও কোথায়," এ কিরূপ কথা? মা ত লুকান না।"

আমি বলিলাম "গুপ্তমহাশয়, আপনার মা লুকান না; কিন্তু আমাদের মা মাঝে মাঝে লুকান। আপনি সাধুপুরুষ, ভগবান আপনার কাছে স্বপ্রকাশ; আমরা দুর্ব্বল, আমরা মধ্যে মধ্যে হৃদয় মন মলিন করি ও তাঁকে হারাই।"

আর একবারের একটী ঘটনা মনে আছে। সেবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের একটি কন্যার বিবাহ উপস্থিত। গুপ্ত মহাশয় ঐ বিবাহ দেখিবার জন্য ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন; আসিয়া তাঁহার পুত্রের বাড়ীতেই আছেন। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় আমার নিকট আসিয়া অনুরোধ করিলেন যে, বিবাহে আমাকেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইবে। আমি স্বীকৃত হইলাম। তখন তিনি দ্বিতীয় অনুরোধ এই করিলেন যে, ব্রাহ্মবিবাহে তিন আইন অনুসারে যে রেজিষ্টারি করা হয় এবং যে জন্য রেজিষ্টার বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকেন, এ বিবাহে তাহা হইবে

না, রেজিষ্টারির জন্ত সেই দিন বৈকালে স্বতন্ত্র সময় রাখা হইবে, এবং রেজিষ্টারির সময়ে ইংরাজীতে উপাসনা করিয়া রেজিষ্টারি করা হইবে, কারণ, সে সভাতে তাঁহার অনেক ইংরাজ বন্ধু উপস্থিত থাকিবেন। আমি বলিলাম "ভগবানের নাম করিয়া রেজিষ্টারির কাজটা হয় সে ত ভালই, কিন্তু আমি দুইবার উপস্থিত থাকিতে পারিব না। আমি সন্ধ্যার সময় গিয়া উপসনান্তে বিবাহ দিব। একটা ইংরেজী প্রার্থনা লিখিয়া দিতেছি, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গিয়া সেটী পাঠ করিয়া রেজিষ্টারি কার্য্য সমাধা করিবেন।"

সেইরূপেই কার্য্য হইল। নগেন্দ্রবাবু বৈকালে গিয়া ইংরাজী সংগীতাদির পর ইংরাজী বন্দনা ও প্রার্থনা পাঠ করিয়া রেজিষ্টারি কার্য্য সমাধা করিলেন। তার পর সন্ধ্যাকালে আমি বিবাহ দিতে গিয়া শুনিলাম, গুপ্ত মাহাশয় রাগ করিয়া পাশের বাড়ীতে আছেন। বিবাহ-স্থলে আসিবেন না, এই সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া আমি তাঁহার নিকটে গেলাম। গিয়া তাঁহার সহিত যে কথা হইল তাহা এই ;—

আমি—গুপ্ত মহাশয়, আপনি নাকি রাগ ক'রে আছেন। বলেছেন নাকি যে উপাসনাতে যাবেন না ?

গুপ্ত মহাশয়।—হাঁ, আমি যাব না ; উপাসনা এ বিবাহে ত হ'য়ে গিয়েছে. কৃষ্ণগোবিন্দ ইংরেজদের ডেকে দেখায়ে দিয়েছে ব্রাহ্ম বিবাহ কিরূপ। ভগবানের নাম হয়েছে, রেজিষ্টারি হয়েছে ; আবার কি ? এক মুরগী দুজায়গায় জবাই, এ কি রকম ?

আমি।—ওঃ বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনি ইংরাজী উপাসনাটা ওই ভাবে নিয়েছেন। তা ভাবছেন কেন ? আমার ত মনে হয়, যে যে বিবাহে রেজিষ্টারিটা স্বতন্ত্র সময়ে হয়, সে সে স্থলে রীতিমত ভগবানের নাম ক'রে রেজিষ্টারি হওয়া উচিত। কেবল আইন টুকু প্রতিপালন

করা হয়, ভগবানের নামটা হয় না, তা আমার ভাল লাগে না। বিলাত-ফেরত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে অনেকের হয়ত এই ভাব আছে যে, রেজিষ্টারি হ'লেই হলো, উপাসনা টুপাসনা কেন? আমি এ ভাব পছন্দ করি না। ভগবানের নাম ভিন্ন বিবাহের কোন কাজ হয়, আমি তা ইচ্ছা করি না। কৃষ্ণগোবিন্দ যখন রেজিষ্টারিটা স্বতন্ত্র সময়ে কর্‌লেন, তখন ভগবানের নাম ক'রে করাই ভাল হয়েছে। এতে আপনার আনন্দিত হওয়াই উচিত।"

আমার কথাগুলি বিষয়টাকে নূতন ভাবে গুপ্তমহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বলিলেন "তাইত! আমি এ ভাবে দেখি নাই। বিবাহসংক্রান্ত কোনও কাজ ভগবানের নাম ছাড়া হওয়া উচিত নয়, ঠিক কথা বলেছেন। চলুন, চলুন, আমি বিবাহস্থলে যাচ্চি। তারপর তিনি আমার সঙ্গে বিবাহ-সভাতে আসিলেন; এবং আমার উপদেশের পর বর কন্যাকে মধুর উপদেশ দিলেন।"

গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুবালা দেবীর পত্র হইতে উদ্ধৃত ;—

"কলিকাতা নিবাসী একটি ভদ্র লোক আমাদের কোন আত্মীয়কে একদিন বলিতেছিলেন, "যদি সাধু কাহাকেও দেখিয়া থাকি তবে তিনি কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়।" আমার আত্মীয় বলিলেন, "আপনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী গুপ্ত মহাশয়কে কি করিয়া জানিলেন?" তিনি বলিলেন "আমি ও আমার একটি বন্ধু কোন কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণনগরে যাইতে-ছিলাম, ট্রেনে উঠিয়া দেখি একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার ভৃত্যকে কি বলিতেছেন। কথা শুনিয়া বুঝিলাম তিনি বাঙ্গাল। আমি অমনি আমার বন্ধুকে বলিলাম, একজন বাঙ্গাল পাওয়া গিয়াছে, সমস্ত পথ বেশ আমোদে কাটান যাইবে। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কোথায়

যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করিলেন কৃষ্ণনগরে যাইতেছি। কি জন্য সেখানে যাইতেছেন? আমার পোলার কাছে যাইতেছি। আপনার পোলা কি করেন? কালেক্টরিতে কাজ করে। নাম কি? কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত। মহাশয় আমরা তো কালেক্টরের কাছারীতে ঐ নামে কাহাকেও জানি না। না মানুষে তারে কে, জি, গুপ্ত কয়। এখন বুঝিলাম এ বৃদ্ধ কে এবং এই সামান্য কথাতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। তার পর অনুতপ্ত হইয়া তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং ষ্টেশনে তাঁহার জন্য কালেক্টর সাহেবের গাড়ী ও চাপরাশী আসিলে, সানুনয়ে তাঁহাকে বলিলাম, অগ্রে আমার কুটীরে পদধূলি না দিয়া আপনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না।"

উক্ত ভদ্রলোক এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়া আমার আত্মীয়কে বলিলেন—"মহাশয়, ধন মানের গৌরব সকলেই করিয়া থাকে, কেবল প্রকৃত সাধুই এ সকল তুচ্ছ করিতে পারেন। গুপ্ত মহাশয়কে দেখিয়া মনে হইল প্রকৃত সাধু দেখিলাম।"

বাস্তবিক কথা এই, তিনি কখনও নিজকে বড় বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন না। আমাদিগকেও এই শিক্ষাই দিতেন।

আমি একদিন আমার শিশু কন্যাকে বলিতেছিলাম—"দেখতো ওরা কেমন দুষ্ট, কিন্তু তুমি খুব ভাল, কেমন দুধ খাও।" বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি অপরের চেয়ে ভাল ও বড়, মা, ছেলে মেয়েদের এ রকম শিক্ষা কখনও দিবে না; সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদেরে বলিবে দেখতো ওরা কেমন ভাল, তোমরাও উহাদের মত ভাল হও।" আমি তাঁর এই অমূল্য উপদেশ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

আমার পিতামহীর লোকান্তর গমনের পর পিতৃদেব তাঁহার মায়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিজ গ্রামে অনেক জনহিতকর কার্য্যের

অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে ভাগিরথী-ছায়া ও ভাগিরথী-জলাশয় প্রধান কীর্ত্তি। বর্ষাকালে দেশের বাড়ীর অতি নিকটে জল আসে, এবং নৌকাও বাড়ীর ঘাটেই লাগে। কিন্তু অন্য সময় গ্রাম হইতে অনেক দূরে থাকে। এই পথ হাঁটিয়া আসিতে হয়। যদিও পথটি প্রশস্ত ও সুন্দর, তথাপি কোন বৃক্ষাদি না থাকাতে প্রখর রৌদ্রে পথিকদের অত্যন্ত কষ্ট হইত। বাবা লোকের এই কষ্ট নিবারণের জন্য রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করান, এবং ঠাকুরমার নামে উহার নামকরণ করেন।

পথের নিকটে কোথাও পানীয় জলের সুবিধা ছিল না। রৌদ্র ও পিপাসায় পথিকদের বড়ই কষ্ট হইত। তিনি মধ্য পথে একটি পুষ্করিণী খনন করান। পুকুর কাটানের সময় যতদিন কার্য্য শেষ না হয় ততদিন সেই জনহীন প্রান্তরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন। যে জমিতে পুকুর কাটান হয়, উহা একজন মুসলমানের অধিকারে ছিল, এবং ঐ জমি ক্রয় করিতে চাহিলে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, কোন হিন্দুব নিকট জমি বিক্রয় করিব না। ইহা শুনিয়া বাবা নিজে সেই মুসলমানের নিকট যান এবং তাহাকে কোলাকুলি করিয়া বলেন "ভাইরে, এই পুকুরতো কাহারও নিজস্ব হইবে না। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে। আশে পাশে গ্রামের বৌ ঝিদের জলাভাবে কত কষ্ট পাইতে হয়! এস্থানে একটি পুকুর থাকিলে তাদেরও কষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইবে। ভাই, তুমি এই জমি আমার নিকট বিক্রয় কর।" এই কথাগুলি প্রেমে বিগলিত হইয়া এমন করিয়া বলিলেন যে, সেই ব্যক্তির পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল। সে বিনা মূল্যে জমি দান করিতে চাহিল। প্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি। বাবা এইরূপে প্রেমে সকলকে বশ করিতেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহার সমধিক সহানুভূতি ছিল। ধনী

দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রীলোককেই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। মেয়েদের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, গুপ্তমহাশয় যেমন "মাগো" বলিয়া মিষ্টস্বরে ডাকিতেন এমন মিষ্ট ডাক আর কারো মুখে শুনি নাই। তাঁহার নিকট যাঁরা দু দিনও বাস করিতেন, তাঁরাই তাঁর স্নেহ ভালবাসার পরিচয় পাইতেন। তাঁর বাড়ীতে আসিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না পরের বাড়ীতে আসিয়াছি। মেয়েরা বলিতেন আমরা বাপের বাড়ী আসিয়াছি।

পিতৃদেবের সঙ্গে একবার পুরীতে যাই। তথায় গিয়া জগন্নাথের মন্দির দেখিতে ইচ্ছা হইল। বাবা বহুদিন পূর্ব্বে একবার আসিয়া জগন্নাথের মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তবু আমাদের ইচ্ছা জানিয়া আমাদিগকে লইয়া মন্দিরে যাইবেন বলিলেন। স্থানীয় একজন ধনী লোকের গাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য ছিল। একদিন আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। আমরা মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইতেই পাণ্ডারা অতি সমাদরে আমাদিগকে লইতে আসিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে কোন ঘটনাতে পাণ্ডারা উত্তেজিত হইয়া দরজায় লিখিয়া দিয়াছিল যে, হিন্দু ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীর মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। বাবা ইহা জানিয়া একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা তো ব্রহ্মজ্ঞানী, আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব কি ?" পাণ্ডারা প্রশ্ন শুনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "না মহাশয়, তা হ'লে আপনারা মন্দিরে যাইতে পারিবেন না।" বাবা হাসিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্মই যে প্রকৃত উপনিষদের ধর্ম্ম। ঋষিরাও যে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।" তিনি তাহাদিগকে এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন—আর তাহারাও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিল—যা বলিলেন সবই তো ঠিক।" কিন্তু তবুও মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিল না। ফিরিবার

সময়—পাণ্ডারা কিছু টাকা চাহিল, তিনি বলিলেন "তোমাদের জগন্নাথ কি বিধর্ম্মীর টাকা লইবেন?" এই বলিয়া আমাদিগকে লইয়া হাসিমুখে চলিয়া আসিলেন। আমাদের আর মন্দিরে যাওয়া হইল না। ইহাতে আমাদের মনে বড় কষ্ট হইল।

পরে একটি হিন্দু মহিলা আমাকে বলিলেন, "সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময় আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" তাঁহার প্রস্তাবে আমিও সম্মত হইলাম। কিন্তু বাবা শুনিয়া বলিলেন—"ইহা কি ঠিক কাজ হইবে?" আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া নিজেই লজ্জিত হইলাম, এবং মন্দির দর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। এই ঘটনাতে তাঁহার সত্যের প্রতি কিরূপ প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট সত্যানুরাগের এইরূপ দৃষ্টান্ত ও উপদেশ পাইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, জীবনের অনেক পরীক্ষায় অদ্যাপি তাহা বলদান করিতেছে।

তিনি তাঁহার জমিদারীর কাছারী কাওরাদিতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। শেষ জীবনে আমরা সন্তানেরা তাঁহাকে বড় নিকটে পাইতাম না। একবার তাঁর সঙ্গে কটকে গিয়াছিলাম। তথায় নানা প্রকার সুন্দর রূপার অলঙ্কার পাওয়া যায়। সেকরা আসিলেই তাঁহাকে নানা প্রকার গহনা ক্রয় করিতে দেখিতাম। তিনি ঐ সমস্ত বাক্সে পুরিয়া রাখিতেন। একদিন আমরা বলিয়াছিলাম, "বাবা, আমাদের জন্য ত কিছু কিনিলেন না।" তিনি বলিলেন—"মা, ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের কিসের অভাব? এদের (কাওরাদির মেয়েদের) কে দিবে? তোমরা যেমন আমার সন্তান এরাও তাই।"

শেষ সময়ে তাঁহার বড়ই সাধ ছিল কাওরাইদে যেন তাঁকে চিতারোহণ করান হয়। সেই জন্য রোগের সময় বলিতেন "আমি

মরিলে আমার দেহ কাওরাইদে লইয়া যাইও। তোমরাতো আমাকে কাওরাইদে থাকিতে দিলে না।"

আমাদের মাতৃদেবীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইয়াছি, শৈশবের সঙ্গিনীকে চিরজীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন।

বাবা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন ঠাকুর মা, মাকে খুব গালা-গালি করিতেন, বলিতেন "তোর দোষেই তো সে এমন হইল। তুই যদি শক্ত হ'তি, তা হ'লে সে এরূপ করিতে কখনই পারিত না।"

মা বলিতেন—"তিনি গিয়াছেন যান, আমি আপনার ধর্ম্মে থাকিয়া আপনার সেবা করিব।" মা তখন ধর্ম্মের আস্বাদ পান নাই। বাবা কোন দিন তাঁকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন রূপ জেদ করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে এমন হইল মা স্বইচ্ছায় তাঁর ধর্ম্মের সঙ্গিনী হইলেন। ইহাতে বাবার আনন্দ ও উৎসাহ দ্বিগুণ হইল। কোন প্রতিবন্ধকই আর তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না।

মায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস এমন সহজ সরল ছিল যে, তিনি রোগশয্যায়ও ভগবানের নাম শুনিলে উৎসাহে উঠিয়া বসিতেন। দারুণ বহুমূত্র রোগে জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ কাল তাঁহাকে প্রায় শয্যাশায়িনী করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এই রোগের কষ্ট কখনও তাঁহার মুখ ম্লান করিতে পারে নাই। তাঁহার ভগবানে বিশ্বাস ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল। যখন সহাস্য বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁর ভক্তি ও জলন্ত বিশ্বাস আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার লিখিত ব্রহ্মসাধক কমলাকান্ত ব্রহ্মদাসের জীবনবৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত :—

"১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে একদিন ডাকে একখানি পত্র

আসিল। কমলাকান্ত পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড় আনন্দিত হইলেন। ঢাকা জেলার অধীন কাওরাদি জমিদারী কাছারী হইতে শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় সেই পত্রখানি লেখেন। পত্রদ্বারা বন্ধুত্ব স্থাপন যে কিরূপ হয় তাহা আমরা অপ্রাসঙ্গিক মনে না করিয়া, চারিখানা পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। ধর্ম্ম-জীবনের কি যে পরস্পর আকর্ষণ তাহা গুপ্ত মহোদয়ের পত্রে বেশ জানা যায়।

প্রথম পত্র।

ঢাকা জেলা, কাওরাদি কাছারী।

৯ই আষাঢ়, ১৩০৫।

সবিনয় নিবেদন, এই

মহাত্মন্! যদিও আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ নাই, না থাকিলেও অপরিচিতের ভাবে, নব্য ভারতে "উপাসনার ভাষাতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্য সত্যই আপনার সঙ্গে প্রাণের আপ্যায়িত ও সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধুতা স্থাপিত হইল, এবং সঞ্জীবনীতে আপনার তত্ত্বোপনিষদের সমালোচনা যে দেখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রবল হইল। আশা এই, তৎপাঠে প্রাণের টান আরও বৃদ্ধি পাইবে, আর মিলিবে; ইহাতে হয়ত আপনার ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ করিয়া দর্শন স্পর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব, প্রাণের কথাসকল বলিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইব। ফলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি অবধি যে সকল মত ভাব পোষণ করি, আপনার প্রবন্ধে প্রায় তাহা একীভূত। গ্রন্থখানা দেখিলে যে আরও কি হইবে দাতা জানেন। নিবেদন শীঘ্র ভেলু-পেবল ডাকে একখানা তত্ত্বোপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠাইয়া বাধিত

করিবেন। উপরে যে ঠিকানা লেখা হইয়াছে, সেই মতে পাঠাইলে পাইব।

বিনীত নিবেদক

শ্রী কালীনারায়ণ গুপ্ত।

দ্বিতীয় পত্র।

১লা শ্রাবণ, ১৩০৫।

মহাত্মন্! আপনার প্রেমের উপহার আমার প্রাণের স্পৃহার ধন, প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিলাম, এখন পান করিতে থাকিব। উদার দাতা কি দিবেন? এই ভাবে পুস্তকখানি ধীরে ধীরে পড়িতে গিয়া তাহার বিশেষ আস্বাদন ভুগিতে ভুগিতে, সম্মুখে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের সঙ্গে ভালবাসায় মন যাচাই করিয়া করিয়া, সকলে মিলে ভালবাসিতে যাই, তাই সমগ্র পড়া হয় নাই, পড়ার আগে বলার নাই।

আত্মপরিচয়ের জন্য আমাদের ভাবসঙ্গীত একখানা বুক পোষ্টে পাঠাই। রাগিণীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া শুধু আগা গোঁড়া বই খানি পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি পত্রখানি যেমন খিচি মিচি, পুস্তকখানিও এইরূপ আপনে দেখিবেন বলিয়া শুদ্ধ করিতে গিয়া কাট কুট করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে আমার কষ্ট হয় নাই; কারণ, পুস্তকে দেখিবেন মুদ্রাঙ্কন অন্য হস্তে হইয়াছে। অবশ্য তিনি যতদূর করিয়াছেন তাহার তুলনায় অজ্ঞাতসারে যাহা ভুল তাহা আমার স্মরণ করাও অনুচিত; তথাচ সেই ক্ষমণীয় ভুল থাকিলেও আপনার ন্যায় লোকের নিকট তাহা ঠিক করিয়া না দিলে মনে বুঝে না, অথচ অন্য কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলেও মন শুদ্ধ হয় না, তাই এই দশা। বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন। এসকল

অবস্থায় পরে "উপহার" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা তাহাই বটে।

এখানে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ আছে। তাহার নাম 'কাওরাদি ব্রাহ্মসমাজ'। সাহা. লগ্নাচার্য্য, রুদ্রপাল শ্রেণীর স্থানীয় কয়েকটি আনুষ্ঠানিক পরিবার এবং ব্যক্তিগত বিবাহিত ও অবিবাহিত ভাবে ২।৩টি পুরুষ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২৫।২৬ জন লোক হইবে। কাওরাদি হইতে ৩।৪ মাইল দূরে দূরে বাড়ী, একস্থানে প্রায় তিন পরিবার আছে। পূর্ব্বে কাওরাদি ব্রহ্মমন্দির যে গৃহে ছিল, তথায় আমার স্ত্রী অন্নদা গুপ্ত কর্ত্তৃক ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের ২০শে তারিখে একখানি ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, সেই গৃহখান লেংটিপাড়া গ্রাম নামক স্থানে উঠিয়াছে। অনেকে সপরিবারে সেখানে সামাজিক ও প্রাত্যহিক উপাসনা করে। আমাদের মন্দির বা সমাজে বসিয়া কোন দেব দেবীর নাম বা মাতা পিতাদি পার্থিব পরিমিত সম্বন্ধে সম্বোধন করি না। খোল, করতাল, ঢাক, ঢোল আদি গোলমেলে যন্ত্র বা শঙ্খ, ঘণ্টা উপাসনা বা কীর্ত্তনে ব্যবহার করি না, স্বর ঠিক রাখার জন্য এক তানপুরা আর করের করতাল বা তুড়ী। সময়ে তানপুরা সঙ্গে যে সকল যন্ত্রের যোগ মিলিতে পারে, যথা বেহালা, এছরাজ, ঢোলক, তবালা, পাখওয়াজ বাজিলেও দোষ মনে করি না; কিন্তু অনেক যন্ত্রে গান খারাপ হয়; কারণ, অন্যে গান স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, ইহাও গোলমাল। অতএব ২।১টি সাহায্যের জন্যই দৈবাৎ কোন সময় রাখিয়া থাকি।

ঈশ্বরের মহা অস্তিত্ব আমাদের সম্পত্তি, ওঁব্রহ্ম আমাদের ধ্বনি, নাম স্মরণ, কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসরই আমরা মাঘোৎসবের অব্যবহিত পর প্রচারার্থে ও ভ্রমণার্থে বিদেশে বাহির হই; তাহাতেই

রাস্তায় ও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঙ্গীত বা কীর্ত্তনাদি ও কথাবার্ত্তা উপাসনা করি। এইরূপ সাদা ভাবে হইয়া থাকে। আমরা অভাবের গান গাই না, ভাবের গানই খুব গাই। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ হয়। সংসার ও ধর্ম্ম ইহার ছোট ও বড়, এই দুই মানিয়া, এই ব্রহ্মযোগে সাক্ষাৎকার জানিয়া, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি আমাদের সাধন হয়। ইতি

নিবেদক শ্রী কালীনারায়ণ গুপ্ত।

তৃতীয় পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

মহাত্মন্, বোধ হয় আমার পত্র ও ভাবসঙ্গীত পাইয়াছেন। সেই সঙ্গে এবার প্রচার জন্য দুইটি নূতন গান ও পুরাতন ২।৩টী গান লইয়া যে একখানা চটি বই ভাব সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা দেই নাই। অতএব এই বই দুইখানা বুক পোষ্টে পাঠাইলাম, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সঙ্গীতটী স্বরূপ সম্বন্ধে ও ভূকম্পের শেষ গানটী নূতন হইয়াছে। অন্য গান বড় পুস্তকে আছে। কোন স্থানে পরিবর্ত্তিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকার বিষয় তাহা দেখিয়া দেই নাই।

এইরূপ প্রায় প্রতি বর্ষেই নূতন ২।৩টি গান সহ পূর্ব্ব গান সঙ্গে দিয়া এইরূপ চটি বই মাঘোৎসবের সময় বাহির হয়, কোন পুস্তকই বিক্রী করা হয় না। ২।৪ বৎসর পরে পরে সাবেক গান ও এই সকল নূতন গান সহ বড় করিয়া পুস্তকাকারে ভাবসঙ্গীত বাহির হইয়া থাকে।

আপনার উপহার 'উপনিষদ্' দুইবার পড়িয়াছি; অনেক স্থানে

এক মহা সংশয় হইয়াছে, আবার পড়িতে পড়িতে তাহা দূর হইয়াছে। ফল কথা পুস্তকের সকল বিষয়ই আমার মৌলিক সংস্কার মূলক। তবে ২।১ স্থানের একেবারে মতের সমান সমান না হইতেও পারে এবং না হওয়াই স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব। আর একটা বিষয় বড় প্রাণের জিনিষ পাইয়াছি। এমন সকল সত্য পুস্তকের মধ্য দিয়া বহিতেছে, যাহা সর্ব্ব সময় বিশ্বাসের উপযোগী হইয়া বর্ত্তমানে বুঝিতে বা বুঝাইতে পুরাতন দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করে। অতএব আপনার কথাতে যে এই মহা সৌন্দর্য্য নিগূঢ় ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই দেখিয়াই আরও ঢলিয়া পড়িয়াছি। এই সত্য না থাকিলে মৃত ভাব, মৃত বিষয়, দিনে দিনে সত্য হইতে অসত্যে, জ্যোতি হ'তে অন্ধকারে, অমৃত হ'তে মৃত্যুতে যাইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মকৃপা এমনই যে, সহস্র বৎসরের অন্ধকার গুহা মধ্যে মশাল লইয়া উপস্থিত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ সমস্তই আলোকিত হয়। এরূপ ব্রহ্মকৃপা অজ্ঞানতা হ'তে আমাদিগকে অবশ্য বিজ্ঞ করেন। সেই কৃপাতেই কত মূর্খ পণ্ডিত হইল, কত মৃতে জীবন সঞ্চার হইল, কত অসাধ্য সাধ্য হইল, হইতেছে, ও অনন্তকাল হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান যদি মানুষকে জীবন্ত মানুষ না করিল, তবে আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও রস কি বুঝিলাম! যদি কেবল সেই পুরাণা বন্দনাই বন্দনা করিলাম, আর জাতি মানিলাম না তবে আর কি হইল? এই মতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়া জীবন্ত জীবন লাভ করুক, প্রাণের কামনা পূর্ণ হোক। অনেক দিন মেঘ থাকিয়া রৌদ্র উঠিলে যেমন সকলের ঘরের ধান্ত ইত্যাদি শুকাইয়া লয়, এমন অনেক দিন পর প্রাণে ব্রহ্মালোক পাইয়া, নর নারী সাধন বলেই ভিজা জীবনকে বিশুদ্ধ

করিয়া, ব্রহ্মদাস ব্রহ্মদাসীতে মিলে ব্রহ্মরাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক তোমার যোগ আমার যোগ এই যোগে জগতের যোগ এক হউক, আর কি ?

ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম

নিবেদক শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

চতুর্থ পত্র।

১লা ভাদ্র, ১৩০৫

প্রাণের ভাই ব্রহ্মদাস, ২খানা ভাব সঙ্গীত ও পত্র দিলাম ; কেন যে প্রাপ্তি সংবাদ পাইতেছি না, তাই মনে নানা কথা উঠে পড়ে, সত্য কি জানিতে চাই। একবার মনে হয় ভদ্রতা বিরুদ্ধ মত কাটকুট করা পুস্তক দেওয়াতে আমার কোন ত্রুটি ধরিয়া বা উত্তর দানে স্তম্ভিত হইয়া আছেন। আবার ভাবি ঠিক কথা বুঝিবার জন্য যাহা করিলাম তাহাতে মনে লাগিবে কেন ? অবশেষে ভাবি একদিকে যখন আপনি রহিয়াছেন তখন এ সব সন্দেহ আমার আত্মবিকার বলিয়া শান্ত হই। আপনার উপনিষদ যে আমার কি মহৌষধ হইয়াছে তাহা জানি না। ভগবানের উদার দান মধ্যে আপনার উপনিষদ শুদ্ধ আমার একটা চিরস্মরণীয় মহাদান। আপনাকে যত পাই, আরও পাইব, আপনি আমার অনন্ত কাল পাইবার ধন। অনন্ত মহামিলনে যে আর কত মিলিব, আর কত পাইব, অনন্ত বিনা তদন্ত কে জানে ? কিন্তু প্রাণে আশার ধারা বহে তাহাতেই ঐ চিরশান্তি বিরাজমান। মায়ের স্তন্য যেমন আসে, আসিয়া মুখ ভরে, পেট ভরে ও স্নিগ্ধ করে। এই আশা পূরণের জন্য আজ আপনি আসিতেছেন, কল্য অন্য আসিবেন, সুখ হইতে সুখ, লাভ হইতে লাভ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। একসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পথ চলিয়া যাওয়া কেমন সুখের ব্যাপার,

আমরা এরূপ হাত ধরাধরি ক'রে চলেছি। ভাই, যদি হাত ধরেছ ছেড় না। তুমি বড় সুন্দর কথা কও। তাই বলি বল, শুনিয়া চলিতে থাকি। জয় ব্রহ্ম জয়।

তার পর দেখা শুনা হইবার বিষয় কি হইতে পারে? দেখার জন্য প্রাণে বড় টান পড়িয়াছে। আর না দেখিয়া যেন পারি না। যখন আপনি তত্ত্ববিৎ তখন অবশ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সময় বুঝিয়া জানাইলে পাথেয় পাঠাইতে পারি, অথবা এখানে আসিলে দিতে পারি। কিন্তু সময়টী পূর্ব্বে জানা আবশ্যক। কারণ, আমার কাওরাদি থাকা চাই। নারায়ণগঞ্জ হইতে দশটা রাত্রে যে ট্রেন নসিরাবাদ যায়, সেই ট্রেন কাওরাদি পৌছে। সেই ট্রেনে রাত্রি প্রায় ৩টার সময় এখানে আসা যায়। আর গোয়ালনন্দের মেল ষ্টীমারে আসিলে সম্ভতঃ দুই হইতে তিনটার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া চারিটার পর ঢাকা পর্য্যন্ত একখানা ট্রেন আসে। ছয়টার সময় ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়া দশটার সময় কাওরাদি পর্য্যন্ত একখানা লোকাল ট্রেন আসে; তাহাতে এখানে আসিলে রাত্রে আহার এক প্রকার সময় মত করা যায়। আশা করি এই ট্রেনে আসিবেন। নিবেদন ইতি

নিবেদক শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত

ইহাতে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, পার্থিব সম্বন্ধ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রবল ও শ্রেষ্ঠ। গুপ্ত মহাশয় কখনও কমলাকান্তকে দেখেন নাই। নব্যভারতে উপাসনার ভাবতত্ত্ব এবং সঞ্জীবনী পত্রিকায় তত্ত্বোপনিষদের সমালোচনা দেখিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে, অপরিচিত কমলাকান্তের সহিত ধর্ম্মানুগত্যে প্রাণের ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক ধর্ম্মের মিলনেই প্রকৃত

আনন্দ। ভৌতিক পদার্থময় শরীরের আশক্তি বশতঃ বাহ্য দর্শনেরও একটু ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সে ইচ্ছাটা উভয়েরই প্রাণে জাগিয়া রহিল, তাহা আর ইহলোকে পূর্ণ হইল না।

মহামতি গুপ্ত মহোদয়ের হৃদয়ভেদী ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় অতি মলিন ভাবাপন্ন মানবেরাও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। আহা! তাঁহার রচিত ভাবসঙ্গীত যিনি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি ভাবের গূঢ়ভাব প্রাণে পোষণ করিয়া বড়ই প্রীতি পাইয়াছেন। সঙ্গীতের ভাষা সরল ও মধুর। কথাগুলি সহজ বটে, অথচ উচ্ছ্বাস অতি প্রবল। বস্তুতঃই ভাবসঙ্গীতের ভিতরে ডুবিলে কখনই তাহা ভুলিতে পারা যায় না।

ইঁহার অনাসক্ত বৈরাগ্যসাধন কেমন সুন্দর তাহাও দেখুন। ইনি সম্ভ্রান্ত জমিদার হইয়া দীন প্রজাদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত থাকেন এবং একাসনে বসিয়া ধর্ম্মালোচনায় পরিতৃপ্ত হন, এইটি কি সাধনবীরত্ব নহে? সম্মান, অভিমান, তাঁহার পবিত্র প্রাণে স্থান পাইবে কি রূপে? রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থলে ভ্রাতৃভাবটির আদর বেশী। কেননা, ভ্রাতৃত্ব তত্ত্বটি ভেদবিনাশের প্রধান সহায়। তজ্জন্য তিনি অধিকারস্থ প্রজাগণকে অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ না রাখিয়া, তাহাদিগকে উদার প্রেমে গ্রহণ করিতেন। এরূপ চরিত্রে যে মরুময় শুষ্ক হৃদয়েও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? নিরক্ষর প্রজাগণের সহিত এতদূর সরল ভাবে ধর্ম্ম সাধন করা সহজ নহে। প্রাণে দেব ভাবের আবির্ভাব না হইলে, ঈদৃশ সাম্যসাধনে সিদ্ধিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ভগবদ্ভক্ত গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গে বাস নিবন্ধন স্বদেশ-ভাষায় সময়োচিত সরল সঙ্গীত রচনা করিয়া

অশিক্ষিত প্রজাদিগকে সাধুভাবে আনিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। স্বদেশ-ভাষায় উপাসনা বক্তৃতাদিদ্বারা ধর্ম্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব শিক্ষা দেন। "বুড়া নাচে পোলার সনে।" ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্গীত সংকীর্ত্তনে সকলকে অল্পসময়ে মাতাইয়া ফেলেন। নিজেরও ভাবাবেশে নৃত্য থামে না। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার দীন প্রজাগণের সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন, এটা কি দেব ভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত নহে? ঐশ্বর্য্যের তীব্র উত্তেজনার ভিতরে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রজাবর্গের সহিত প্রেমে উন্মত্ত হওয়া, জগতে এটিও এক অভিনব চিত্র। মানুষ সম্পদমদে অধীর হইয়া, বলিতে কি, আপন সহোদর ভ্রাতাকেও নির্য্যাতন ও তিরস্কার দ্বারা বিতাড়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কত শত অভিযোগ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করে, আবার কেহ বা সেই পাশব প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া, দেব ভাবের প্রভাবে প্রাণী মাত্রকে উচ্চ তুলনায় আপনাকে তুচ্ছ মনে করেন। তবেই বলিতে হয়, সংসার বিষে অমৃতে জড়িত, ইহা সাধু সজ্জনেই বুঝিতে পারেন।

সত্য কথা স্পর্শমণি স্পর্শে কঠিন লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়। সাধু সংসর্গে অসাধুও মলিন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হইতে পারে। গুপ্ত মহোদয়ের সঙ্গলাভে তাঁহার নিরক্ষর প্রজাপুঞ্জও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। একাত্মময় ব্রহ্মজ্ঞান ইঁহার জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক শরীরাধারে একই ব্রহ্মশক্তি বর্ত্তমান, আবার ঐ পূর্ণ শক্তিই অর্থাৎ পিতৃশক্তির প্রকারভেদে যে প্রাণী মাত্রই সন্তানত্ব সংজ্ঞায় পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সখ্যবন্ধনে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা, ইহাই ত মুক্ত পুরুষের মধুর ভাব। ইহা গুপ্ত মহোদয়ের একপ্রাণতার পবিত্র

ভাবের ভিতরে দেখা যায়। অথচ ভ্রাতৃপ্রেমই তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের সঞ্চিত অমূল্য রত্ন। পার্থিব রত্নরাজি তাঁহার নিকট ধূলিকণা হইতেও অসার।"

শ্রাদ্ধে পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ।

"তিনি যখন কাহারও সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, প্রশ্নাদির প্রত্যুত্তর দিতেন, তখন মনে হইত যেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আধুনিক ও প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া, নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রচার করিতেছেন। আত্মা কি, অনাত্মা কি, আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি, পাপ পুণ্য, পরলোক, উপাসনা, ব্রহ্মানন্দ, ধর্ম্মের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ে অতি পরিষ্কার রূপে অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিতেন। অধ্যয়ন না করিয়াও যে সাধক কেবল অন্তর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

গুপ্ত মহাশয়ের সাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল নামসাধন। কোন বিশেষণবাচক নাম—যেমন দয়াময়, প্রেমময়, জননী ইত্যাদি সাধন করিতেন না; আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত এবং ভারতের অমূল্য সম্পত্তি "ওঁ ব্রহ্ম" নাম সাধন করিতেন। যখন ভক্তিভাবে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতেন, তখন যেন শিরায় শিরায় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইত। এ নাম গোপনে, নির্জ্জনে, সকল সময়ে সাধন করিতেন। এই নাম উচ্চারণ করিয়া আনন্দের দিনে উৎসাহ, বিপদের দিনে শান্তি লাভ করিতেন। যখন সুযোগ্য পুত্রের মৃত দেহের পার্শ্বে এবং কক্ষান্তরে আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতেছিলেন, সে সময়ে সেই বৃদ্ধ পিতা এক একবার ব্রহ্ম নামের হুঙ্কার করিয়া যেন দুর্জ্জয় শোককে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। যে নাম শোকের সময়ে এমনি স্থিরতা, গম্ভীরতা এবং

নির্ভয়ের ভাব আনয়ন করে, সে নাম বাস্তবিকই ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন। অনেক সময়ে ব্রাহ্মদিগকে লোকে ব্রাহ্ম বলিয়া চিনিতে পারে না। নানা কারণে সাধারণ সমীপে যেন ব্রাহ্মত্ব লুক্কায়িত থাকে ; কিন্তু গুপ্তমহাশয়ের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি কোন স্থানে উপস্থিত হইলে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লোকে বুঝিতে পারিত ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। বারংবার ওঁব্রহ্ম নাম উচ্চারণ ইহার প্রধান কারণ ছিল।

গুপ্ত মহাশয়ের দেব জীবনের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই ধর্ম্মের ক্ষুধা বাড়িয়াছে। তিনি জমিদার এবং গভর্ণমেণ্টের সম্মানিত কর্ম্মচারিগণের পিতা হইয়াও, অতি সাধারণ ভাবে সাধারণ লোকের সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার কোমল মধুর ব্যবহারে অনেকের মন গলিয়া যাইত। তিনি সকলকে আপনার করিয়া লইতেন।

তাঁর আর একটি বিশেষত্ব এই, মতে সাধনায় প্রচারে আজীবন-ব্যাপী একনিষ্ঠা। তিনি যৌবনে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল আলোকময় পথে উপনীত হইয়াছিলেন, আজীবন সেই এক পথে চলিয়াছেন, যে ব্রহ্মনাম ধর্ম্মজীবনের প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অস্পষ্ট স্বরে সেই নাম বলিতে বলিতে; পরলোক গমন করিয়াছেন। যে প্রচারকার্য্যকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, একদিনও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ দৃঢ়তা, এরূপ নিষ্ঠা, এরূপ অচঞ্চল ভাবই ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পত্তিবিশেষ।

গুপ্ত মহাশয় জীবনের একটি সুন্দর চিত্র আমাদিগকে প্র দ র্শ
দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সেখানে গিয়া যেন অমৃত স্বরে বলিতেছেন ;—

হে ব্রাহ্ম, তুমি জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। কিন্তু যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হও, তবে সামান্য জ্ঞান লইয়াই পরব্রহ্মসদনে উপস্থিত হও। আধ্যাত্মিক সাধনে প্রবৃত্ত হও, তিনি তোমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি আত্মাতে, হৃদয়ে, মনে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিবেন, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইবে। যে পথে আসিয়াছ সে পথে চলিতে থাক, তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে। ওঁ ব্রহ্ম নাম সাধন কর, এ নাম জগদ্বাসীকে শুনাও, নামের তরঙ্গ উঠুক, সেই তরঙ্গে পাপ মলিনতা ধুইয়া যাউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর। অর্থ দ্বারা, শক্তি সামর্থ্য দ্বারা এবং বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা এ ধর্ম্ম প্রচার কর। এ ধর্ম্ম প্রচার না করিলে ব্রাহ্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এরূপ প্রত্যাশা করিও না।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

মৃত্যু দেহের ধর্ম্ম। দেহ ব্যাধিতে পীড়িত ও জরায় জীর্ণ হয়; অবশেষে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। কিন্তু আত্মা অক্ষয়, অমর ও অবিনাশী। দেহের বিনাশে আত্মার উন্নতির বিরাম নাই। ভক্ত কালীনারায়ণ আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাসবান ছিলেন। সুতরাং দেহের বার্দ্ধক্যে আপনাকে কখনও জরাগ্রস্ত মনে করেন নাই। এবং তজ্জন্য এক দিনের তরেও মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁহাকে অবসাদগ্রস্ত বা নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। বরং বার্দ্ধক্যে, ধর্ম্মজীবনের পরিণতিতে, আপনাকে ভগবানের

কচি খোকা মনে করিয়া, নিত্য নূতন জীবনে উন্নীত ও নবভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ভগবৎ নির্দ্দেশমত জীবন যাপন করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শেষ বয়সে কেহ তাঁহাকে "বুড়া কর্ত্তা" নামে ডাকিলে তাহা তাঁহার মনঃপূত হইত না। তিনি বলিতেন, "লোকে বলে আমি বুড়া হইয়াছি, আমি দেখি দিন দিন যুয়ান হইতেছি।" নিত্য নূতন উৎসাহে যাঁর জীবন পরিচালিত, আনন্দময় ব্রহ্মের অর্চ্চনা ও আরাধনায় যাঁর আনন্দ, বৃদ্ধত্বের পরিচায়ক নাম কি তাঁর প্রিয় হইতে পারে? বৃদ্ধবয়সেও যৌবনোচিত উৎসাহে শিষ্যমণ্ডলীসহ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি তাঁর উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনেরই পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি গাহিয়াছেন "প্রাণনাথ, তুমি আমার নবীন পরাণ।" ফলতঃ ভগবৎসংসর্গে তিনি নবীন প্রাণ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁর মৃত্যুভয় তিরোহিত হইয়াছিল। কঠিন অস্ত্রচিকিৎসার সময় কেবলমাত্র ব্রহ্মনাম সার করিয়া যে অসীম ধৈর্য্য তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মানুষের বর্ত্তমান আয়ুষ্কাল যেরূপ সংকীর্ণ, তাহাতে ৭৩ বৎসর দীর্ঘায়ুই বলিতে হইবে। ৭৩ বৎসরে অনেকের দেহ এবং সেই সঙ্গে মনের এমন পরিবর্ত্তন হয়, যাহাতে কর্ম্মের বাহিরে যাইতে দেখা যায়। কিন্তু কালীনারায়ণের জীবনে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখি। উৎসাহ বশতঃ এ বয়সেও বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া, দূরে শিষ্য-মণ্ডলী মধ্যে, তিনি ধর্ম্মের সাধনে ও প্রচারে শেষদিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। যে বয়সে লোকে পুত্র কন্থার সেবার কাঙ্গাল হয়, সে বয়সে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের হইতে দূরে গিয়াছেন।

কিন্তু মানুষের দৈহিক চেষ্টার বিরাম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কর্ম্ম-প্রবাহ এবং ধর্ম্মোৎসাহের মধ্যদিয়া ভক্ত কালীনারায়ণের পার্থিব

জীবনের অবসান নিকটবর্ত্তী হইল। বিশ্বাসীর নিকট ইহা অবসান নয়, অবস্থান্তর মাত্র। ইহ—পরলোকের ব্যবধান তাঁহাদের নিকট নাই, মৃত্যুকে তাঁহারা অমৃতের সোপান জ্ঞান করেন। ভক্ত, বিশ্বাসী কালীনারায়ণ ১৯০৩ সালের আষাঢ় মাসে, ৭৩ বৎসর বয়সে, অমৃতের সোপানে পদার্পণ করিয়া, অমর লোকে গমন করিলেন। ইহা প্রকৃত পক্ষে শোকের ব্যাপার না হইলেও, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তাঁহারা শোকের মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত হইলেন।

বাঙ্গালা ১৩১০ সনের আষাঢ় মাসে তিনি জমিদারী কার্য্য উপলক্ষে ধামসুর নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার জ্বর হয় এবং কাওরাদি কাছারীতে চলিয়া আসেন। তথাকার লোকেরা তাঁর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর অল্প হইলেও তাঁর কথা যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, এমন বোধ করিয়া, ভাটপাড়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে তাঁহাকে ঢাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া তথায় টেলিগ্রাম করিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয় বাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া আসিলেন। এই সময় ২।১ টী কথা ছাড়া বলিতে পারিলেন না। পরে কথা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু তবু জ্ঞান ছিল। ব্রহ্মনামে চির-অনুরাগী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় তখন নিকটে বসিয়া ওঁ ব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন।

পরিবারের ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয় রোগ গুরুতর দেখিয়া সিভিলসার্জ্জন ডাঃ ব্রহ্মচারীসহ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর সহধর্ম্মিণী সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁর সেবা খুব পছন্দ করিতেন।

শেষদিন মেজবউ পুত্র কন্যা সহ আসিলেন, এবং ডাকিলে একবার চাহিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন না। এইরূপে ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে ৫।৭ দিন কাটিল। অবশেষে ১২ই আষাঢ় রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকার সময়, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, আত্মীয় স্বজন এবং শিষ্যমণ্ডলীর কণ্ঠে ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে, শান্তভাবে, ব্রহ্মের চরণে ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্তের শেষ নিঃশ্বাস নিপতিত হইল। ইহাতে একদিকে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মহাশোকের ক্রন্দন, অপর দিকে অদৃশ্য পরলোকে পূর্ব্বগামী সাধু আত্মাগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইল।

জন্মে আনন্দ, প্রস্থানে নিরানন্দ, ইহা মহৎ ভাগ্যেরই চিহ্ন বটে। পৃথিবীতে যাঁহার জীবনের বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা ও সরলতা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বহু লোক যাঁহার জীবনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, যাঁহার রচিত ভাবসঙ্গীত ধর্ম্মরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার কণ্ঠে ঐ সকল রসপূর্ণ ভগবৎকীর্ত্তন শুনিয়া আপামর সাধারণ সকলে অতিমাত্র বিমোহিত হইয়াছে, ওঁ ব্রহ্ম ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া মৃতপ্রাণ জাগাইয়া দিতে যাঁহার মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই, আজ চির দিনের তরে তাঁর রসনা স্তব্ধ এবং বাক্য নীরব হইল। আর তাঁর সংসর্গ পাওয়া যাইবে না, আর তাঁর মধুর উপদেশ শুনিয়া তাঁর প্রিয়তম শিষ্যমণ্ডলী মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না, আর তাঁর পুত্র পৌত্র, কন্যা জামাতা ইত্যাদি আত্মীয়গণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিবেন না, ইহা মনে করিলে কোন্ বিশ্বাসী ব্যক্তি, ক্ষণ-কালের জন্য হইলেও, ব্যথিত না হইয়া পারেন? তাই তাঁর তিরো-

ধানের সংবাদে চতুর্দ্দিকের বন্ধুগণ ম্রিয়মাণ হইলেন! তাঁর গুণের ও প্রেমের কথার উল্লেখ করিয়া কত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বিধাতার বিচিত্র লীলার কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

তাঁর ইচ্ছা ছিল কাওরাদি কাছারীতে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যমণ্ডলী-মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নিপতিত হয়। কিন্তু সুচিকিৎসার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঢাকায় আনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। ইহাতে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁর ঢাকার গৃহে আহ্বান করা হইল। তাঁরা তাঁর পার্শ্বে থাকিয়া ব্রহ্মনাম শুনাইয়া তাঁর আনন্দ বিধান করিলেন। এবং অন্তিম সময়েও তিনি তাঁহাদের কণ্ঠে ব্রহ্মনাম শুনিয়া আনন্দময়ের অমৃতক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। তখনকার পবিত্র দৃশ্য এখনও চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। পরিবেষ্টিত শিষ্যমণ্ডলী তাঁর রচিত ভাবসঙ্গীত প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত এবং, ক্ষণকালের জন্য হইলেও, ব্রহ্মলোকের আভাস প্রতিভাত করিয়া তুলিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবগণ সংবাদ পাইয়া দলে দলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একত্র হইয়াছেন, মৃত শবের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পবিত্র এবং গম্ভীরভাবে ব্যাকুলতাপূর্ণ ব্রহ্মোপাসনা হইতেছে, "ইহলোক পরলোক কভু নয় পৃথক" এই বোধ সকলের প্রাণে জাগ্রত হইয়াছে।

স্বর্গ আর কোথায়? এই পৃথিবীতেই এইরূপে ভগবৎগুণকীর্ত্তনে রত সমবেত ভক্তমণ্ডলীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতেছে। ধন্য পরমেশ্বর, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ইহার পর যুবক এবং প্রবীণ ব্রাহ্মগণ, আষাঢ়ের মুষলধারা মাথায় লইয়া. সাধু আত্মার শবদেহ শ্মশানে উপনীত এবং শেষ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন;—জড়দেহ জড়ে বিলীন এবং শুদ্ধাত্মার স্মৃতি বিশ্বাসি-

গণের প্রাণে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকিল। তৎপর ২৭শে আষাঢ় কলিকাতায় কন্যা জামাতা এবং আত্মীয়গণ এবং ঢাকায় পুত্র পৌত্রাদি সকলে ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, দান, প্রীতিভোজন ইত্যাদি সহকারে পবিত্র ও গম্ভীরভাবে তাঁর পুণ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

নিম্নে কন্যাগণের প্রার্থনা এবং আত্মীয় স্বজনের পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংক্ষেপে মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

"হে প্রাণারাম পরম ব্রহ্ম, আজ শোকদগ্ধ হৃদয়ে তোমার কাছে আসিয়াছি। বড় সাধ হইতেছে যে, আজ তোমারই প্রসাদে ইহলোক এবং পরলোক এক দেখিব এবং পরমারাধ্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে প্রাণের ভিতরে সুস্পষ্ট অনুভব করিব ও তাঁহাদিগকে অন্তরের গভীরতম ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া প্রাণ শীতল করিব। প্রভো! আজ এই পবিত্র দিনে তুমি আমাদের হৃদয়ে উপবেশন কর ও আমাদের পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে ভাল করিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। তোমারই বিশেষ দয়া বলে আমরা এমন দেবদেবী পিতামাতা লাভ করিয়াছিলাম ও এতকাল তাঁহাদের স্নেহ মমতায় অতিযত্নে সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রিয়তম প্রাণারাম ব্রহ্মনাম তাঁহাদেরই ভালবাসার প্রভাবে আমাদের দুর্ব্বল মনকে সতেজ রাখিয়াছে। যেখানে যখন রহিয়াছি, স্মরণে প্রাণ ভরিয়াছে, কত আনন্দ কত শান্তি পাইয়াছি! কত বিপদ্ রাশির মধ্যেও তাঁহাদের স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা মনে করিয়া নিরাপদ রহিয়াছি, তাঁহাদের জীবন ভাবিয়া ধন্য হইয়াছি! আজ দুই সপ্তাহ কাল হইল, প্রভো, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছাতে আমরা পিতাকে এ জনমের মত হারাইয়াছি। আর তাঁহাকে এখানে পাইব না। আর তাঁহার

পদধূলি লইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারিব না। তাঁহাকে হারাইয়া, প্রভো, সংসার শূন্য দেখিতেছি, চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। প্রাণারাম পূর্ণ ব্রহ্ম, আজ আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, আমাদের পিতামাতা পরলোকে গিয়াও আমাদের ছাড়া হন নাই। এখনও তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা রহিয়াছেন। আমাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিয়ত রাখিয়া আমাদের মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন, তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে বসিয়া আমাদের ভাবনা কত ভাবিতেছেন! আজ তাঁহারা দুজনে তোমাতে ডুবিয়া অনন্ত সুধা পান করিতেছেন। আমরা ত প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগকে হারাই নাই, হারাইব না। তোমারই সঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রতিদিন হৃদয়মধ্যে দেখিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ পূর্ব্বক জীবন শীতল করিব। আমরা যেন তাঁহাদের চরণ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদের প্রাণারাম ব্রহ্মনাম হৃদয়ের সম্বল করিয়া, অনন্ত লোকের পথে ক্রমে অগ্রসর হই, যেন মধুময় ব্রহ্ম নাম আমরা সাধনরূপে প্রাণে ধারণ করিতে শিখি।

ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিতে করিতে বাবা দেহমুক্ত হইয়া অনন্ত রাজ্যে চলিয়া গেলেন, আমরা সম্মুখে বসিয়া তাহা দেখিলাম। বাবার সে সময়ের শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া শোকের মধ্যেও কত আরাম ও শান্তি পাইয়াছি। প্রভো, তুমি এই কর, আমরা যেন কোন অবস্থায় সে মূর্ত্তি ভুলিয়া না যাই। বাবার ও মায়ের জীবনের প্রভাব আমাদের চরিত্রে প্রকাশিত হউক। আমরা যাহাতে এ সংসারে একদিনের জন্যও তাঁহাদের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে সমর্থ হই, তুমি নাথ, সে আশীর্ব্বাদ কর। পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীর নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করতঃ, সংসারের প্রতি কাজে প্রবৃত্ত হইতে

তুমি সহায় হও। প্রভো, আজ পরলোকগত আত্মাসহ তুমি প্রকাশিত হও। আমরা আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করি।

আমাদের পিতামাতা যে কেবল আমাদের পূজ্য ও ভক্তিভাজন ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা আরও কত লোকের শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। প্রভো, আমাদের কি সৌভাগ্য! তুমি ধন্য, বাবা ও মা ধন্য। ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে এবং তোমাকে প্রণাম করি।

হে ইহলোক পরলোকের প্রভু, তোমারই ইচ্ছায় পিতা মাতা পাইয়াছিলাম। তোমারই ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে হারাইয়াছি। সংসারে এত দিন বাপ মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। হে প্রভো, এতদিন যে বাপ মায়ের আশ্রয়ে সুখে দিন কাটাইতে পারিয়াছি, এ অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য আজ মস্তক পাতিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। সাত বৎসর হইতে মায়ের স্নেহমূর্ত্তি এ সংসারে আর দেখিতে পাই না। তাঁহাকে সংসার হইতে তোমার ক্রোড়ে লইয়া গিয়াছ। তাঁহার প্রস্থানের পর পিতারই আশ্রয়ে ছিলাম। সে আশ্রয় আজ পনর দিন হইল দূর হইয়াছে। এতদিন পিতা মাতার স্নেহ দুই ভাগ হইয়া ইহ পরলোকে সমান ভাবে বিরাজ করিতেছিল। সংসারে পিতার আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে প্রাণের পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই। পরলোক হইতে মাতার আশীর্ব্বাদ অবতরণ করিয়া তবে প্রাণের সম্যক্ তৃপ্তি বিধান করিয়াছে। প্রভো, আজ পনর দিন হইল সেই ইহলোকবাসী পিতা তোমার ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এখন পিতামাতার মিলিত আত্মার মিলিত আশীর্ব্বাদ পরলোক হইতে আমাদের উপর আসিতেছে। প্রভো, সংসারে অনেক পিতা মাতা দেখি, কিন্তু এমন গুণের সাগর পিতামাতা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? তোমার বিশেষ দয়া যে, এমন পিতামাতা আমাদিগকে দিয়াছিলে।